তথ্য অধিকার আইন

সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা

তথ্য অধিকার আইন

সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা

World Bank Institute

MRDI

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : জুন ২০১১

ISBN : 978-984-33-3642-2

বাংলাদেশে মুদ্রিত

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
২/৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১০৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১০৭১৪৭
ই-মেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

বিষয়সূচি

ভূমিকা ১

সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা

ভেজাল ঔষধ ৪

রহস্যজনক ফান্ড ১৩

তথ্যের আইনি অনুসন্ধান লড়াইয়ের কাছাকাছি ২৫

আরটিআই প্রয়োগে সাংবাদিকদের আগ্রহ কম ৪২

আইনে মোড়া তথ্য এবং অধিকার অর্জনের পালা ৫২

তথ্য অধিকার আইন এবং আমার অভিজ্ঞতা ৬৩

ভূমিকা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল তথ্যের অধিকার, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে তথ্য পাওয়া ও প্রকাশ করার অধিকারের দাবি তুলেছিল। পরবর্তী সময়ে বেসরকারি সংগঠন, সুশীল সমাজের আন্দোলন ও দাবির মুখে আইনটি পাস হয়। আইনটি মূলত মানুষের কল্যাণের জন্য, আর সাংবাদিকতার নৈতিকতার মধ্যেই রয়েছে জনকল্যাণের জন্য সত্যের অনুসন্ধান ও প্রচার এবং সবার জন্য ন্যায্যভাবে তা সরবরাহ করা। তাই আইনটি সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে—এই আশা সকলের।

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্যাম্পেইনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই এমআরডিআই সাংবাদিকদের জন্য দুর্নীতি অনুসন্ধানে তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ, সাংবাদিকদের জন্য হ্যান্ডবুক ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তবে এ কথা সত্য যে, দিনের কাজের ডেডলাইন, সূত্রের প্রতি নির্ভরশীলতা এসব সীমাবদ্ধতার বিবেচনায় সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইনকে খুব সাদরে গ্রহণ করতে হয়তো চাইবে না।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে একজন সাংবাদিক কীভাবে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে পারেন এবং তার অভিজ্ঞতা অন্যদের মধ্যে প্রচার করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গত সাত মাস ধরে এমআরডিআই, বিশ্বব্যাংক ইনস্টিটিউটের সহায়তায় বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত একটি বাংলা দৈনিক, একটি ইংরেজি দৈনিক ও একটি টিভি চ্যানেলের

প্রতিবেদক এবং সংবাদসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করেছে। এই কাজের সঙ্গে সার্বিকভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস্-এর সাবেক প্রতিবেদক রালফ ফ্রেমোলিনো। শুরুতে একটি ধারণা ও আশা নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছিল সাংবাদিকেরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করবেন। এই প্রতিবেদনগুলো হবে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ যে তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

উদ্দেশ্য বিচারে এই প্রকল্পের সফলতা সেভাবে দাবি করা যাবে না, কারণ এখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাজ করেছে। আর বাংলাদেশে কোনো সাংবাদিক এই আইনটি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা এখনো অর্জন করেনি। তাই পুরো কাজটিকে যদি আমরা একটি শিখন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করি, সেটাই সবচেয়ে যৌক্তিক হবে। একটি বিষয় হলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে সাংবাদিকদের যাওয়ার সুযোগ কম। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, দিনের অ্যাসাইনমেন্ট, জরুরি ইভেন্ট (যেমন, এ সময় পৌরসভা নির্বাচন, লিবিয়া থেকে বাংলাদেশীদের ফেরত পাঠানো ইত্যাদি জরুরী বিষয় ছিলো), বিটের রিপোর্ট, স্পেশাল রিপোর্টের চাপে সাংবাদিকেরা সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকেন। সাংবাদিকদের মানসিকতা অর্থাৎ যেই বিটে কাজ করেন সেখানকার সোর্সের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্বে যেতে চাননি তারা। অনেক সময় কর্তৃপক্ষ মৌখিকভাবে উত্তর দিতে চেয়েছে, যা আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বোপরি কর্তৃপক্ষের তথ্য আবেদনপত্র গ্রহণের অনীহা, তথ্য দেওয়ার অনীহা, পাশ কাটানো মনোভাব, তথ্যের চেয়ে আবেদনপত্রের ভুলভ্রান্তির প্রতি বেশি মনোযোগ—এসব বিষয় সাংবাদিকদের নিরুৎসাহিত করেছে। প্রকল্পের মাঝামাঝি পর্যায়ে টেলিভিশন চ্যানেলের পুরো টিমকেই হারাতে হয়েছে তাদের বিশেষ অ্যাসাইনমেন্টের কারণে।

কিন্তু এই প্রকল্পের প্রভাব আমরা *সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা* বিষয়ক এই প্রকাশনাটি থেকে বিস্তারিত জানতে পারব। প্রথমে যারা এই আইন সম্পর্কে খুব একটা জানতেন না তারা প্রায় ৩০টি আবেদন করেছেন ১৫টি কর্তৃপক্ষের কাছে। তাদের মধ্যে তিনজন প্রতিবেদক তথ্য কমিশন পর্যন্ত অভিযোগ করেছেন। তথ্যের জন্য তারা অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেছে নিয়েছিলেন। এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই, এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোকে (অংশগ্রহণকারী) রাতারাতি তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে পরিচিত করতে পেরেছে এবং তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে এই বার্তাটি অন্তত দিতে পেরেছে যে আইনটিকে অবহেলা করার আর সুযোগ নেই।

তথ্যের জন্য যেসব আবেদন করা হয়েছে তাদের অনেকেই এখনো পর্যন্ত পুরো বা আংশিক তথ্যই পাননি। তথ্য কমিশনের আদেশের পরেও অনেক কর্তৃপক্ষ তথ্য দেয়নি। তবে চারজন সাংবাদিকই আশাবাদী; তারা লেগে থাকবেন যত দিন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ না হয়। প্রত্যেকেই তাদের অভিজ্ঞতা ও ভুলগুলো তুলে ধরেছেন এবং

আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন। ক্লাসরুমের প্রশিক্ষণের বদলে সাংবাদিকেরা হাতেকলমে এখানে আইনটি ব্যবহার করে এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পার্শ্ববর্তী ভারতের আউটলুক ম্যাগাজিনের অনুসন্ধানী সাংবাদিক সৈকত দত্তের অভিজ্ঞতা জানতে পেরেছেন, দেশের তথ্য অধিকার আইন বিশেষজ্ঞ অনন্য রায়হান ও ব্যারিস্টার তানজীব-উল আলমের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছে।

সাংবাদিকদের এই অভিজ্ঞতাগুলো ভবিষ্যতে যারা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করবেন, তাদের দিক-নির্দেশনা দেবে আশা করি। তথ্য অধিকার আইন সাংবাদিকের জন্য কোনো প্রকল্পনির্ভর কাজ নয়, উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সাংবাদিকেরা তথ্য অধিকার আইনকে তাদের অনুসন্ধান ও প্রমান্য তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানোর মাঝেই এই প্রকল্পের সফলতা।

এই প্রকাশনায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তা কোনোভাবেই এমআরডিআই-এর বক্তব্য নয়, এটি সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতার বর্ণনার হুবহু প্রকাশ। ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্য অভিজ্ঞতাগুলোর ইংরেজি সারসংক্ষেপও সংযুক্ত করা হয়েছে।

এই উদ্যোগটির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সাংবাদিক বন্ধুদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। তাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যারা এই কাজটির সঙ্গে যুক্ত হতে অনুমোদন করেছেন তাদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। রালফ ফ্রেমোলিনো নিবিরভাবে পরামর্শ দিয়ে কাজটিকে বেগবান করেছেন। সর্বোপরি ব্যারিস্টার তানজীব-উল আলম এবং ডি.নেটের নির্বাহী পরিচালক ড. অনন্য রায়হানকে ধন্যবাদ বিভিন্ন সময়ে আইনটি সহজভাবে ব্যাখ্যা করে সাংবাদিকদের সহযোগিতার জন্য।

সাংবাদিকদের জন্য এই প্রকাশনাটি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের জন্য বিশ্বব্যাংক ইনস্টিটিউট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

ভেজাল ঔষধ

ইমরান হোসেন, স্টাফ রিপোর্টার, দি ডেইলি স্টার

যেখানে শুরু

২০০৯ সালে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নিয়ে কাজ করেছিলাম, ১৯৯১-৯২ সালে ভেজাল প্যারাসিটামল উৎপাদনকারী পাঁচটি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে জব্দ করা হয়েছিল, যাদের বিষাক্ত ওষুধ সেবন করে প্রায় ২ হাজার ৭০০ শিশু মারা যায় সে সময়। তখন থেকেই এ বিষয়ে আরও গভীরে জানার একটা ইচ্ছে রয়ে গিয়েছিল। গত বছরের শেষের দিকে জানতে পারলাম, আমি ও আমার সহকর্মী পরিমল পালমাকে অফিস থেকে এমআরডিআই-এর তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে একটি উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে। লা ভিঞ্চিতে প্রথম মিটিংয়েই রালফ ফ্রেমোলিনো আমাদের দেশের সদ্য পাওয়া তথ্য অধিকার আইন এবং এই আইন সাংবাদিকের কীভাবে কাজে আসবে সে বিষয়ে দিগন্ত উন্মোচন করলেন। তখনই ভাবতে থাকলাম ঐ শিশুদের মৃত্যুর কারণ যেখানে লুকিয়ে আছে সেখানে আরও অনুসন্ধান করা যায় এই আইন ব্যবহার করে।

আমার অভিজ্ঞতা

তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হওয়ার দেড় বছর পর এক সকালে ওষুধ প্রশাসনের মহাপরিচালক আমাকে প্রমাণ করতে বললেন যে সত্যিই আইনটা পাস হয়েছে কি না। ৪ নভেম্বর, ২০১০। আমি তখন হাতে লেখা একটা দরখাস্ত নিয়ে বসে আছি মহাপরিচালকের সামনে। ১৯৯২-এ বিষাক্ত ওষুধ তৈরির ঘটনার বিষয়ে এক পাতা প্রশ্ন নিয়ে আমি তার সামনে বসে

আছি। তথ্য অধিকার আইনের অধীনে আমার দরখাস্তটাতে একবার চোখ বুলিয়ে উনি দেখতে চাইলেন তথ্য অধিকার আইনটি।

'আইনটা যে পাস হয়েছে তা বুঝব কীভাবে? আপনার সাথে আইন আছে?' জিজ্ঞেস করলেন মহাপরিচালক।

অনুমতি নিয়ে ওনার কম্পিউটারে অনলাইন অনুসন্ধান করে দেখালাম, ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে।

'আমরা জানব কীভাবে সরকার কখন কোন আইন প্রণয়ন করে সংসদে। কত আইনই তো পাস হয় সংসদে। সরকার আমাদের কোনো নোটিশ দিয়ে জানায়নি এখনো এ ব্যাপারে।' বললেন মহাপরিচালক এবং তাৎক্ষণিকভাবে জানালেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন এবং উনি তখনই দরখাস্তটি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিলেন অনুমতির জন্য। মহাপরিচালক তখনো নিজেও জানেন না আইনে কী আছে। উনি জানেন না, এই ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

রালফ ও আমি মাথা খাটিয়ে বের করেছিলাম, কত বেশি কর্তৃপক্ষের কাছে আইনের আওতায় আমি দরখাস্ত করতে পারি। একই বিষয়ের ওপর আমি নয়টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত করি দরখাস্ত জমা দেওয়ার জন্য। তালিকাটি তৈরি করেছিলাম সম্ভাব্যতার ওপর। আমার বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলো—যার মধ্যে হতে পারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পুলিশ প্রশাসন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ইনস্টিটিউট। ২০১০ নভেম্বরের ৪ তারিখে পাঁচটি, ৭ নভেম্বরে দুটি এবং ২২ নভেম্বরে দুটি দরখাস্ত করি প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

প্রতিষ্ঠানগুলোর একটিতেও তখন পর্যন্ত আইন-নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই। বাধ্য হয়েই দরখাস্ত করি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান বরাবর। এমনকি পুলিশ প্রশাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং সব জায়গাতেই সপ্তাহ ব্যয় হয়ে যায় জানতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন কি নেই?

প্রথমত, তাদের অধিকাংশই জানেন না তথ্য অধিকার আইনের অস্তিত্ব। দ্বিতীয়ত, যারা জানেন তারা এক কথায় উত্তর দেন, আমি এই বিষয়ে অন্য কিছু সম্পর্কে অজ্ঞাত।

মজার ঘটনাটি ঘটল জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ইনস্টিটিউটে দরখাস্ত জমা দেয়ার সময়। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অস্বীকার করল অফিশিয়ালি দরখাস্ত জমা নিতে। তারা কিছুতেই আমার দরখাস্ত অফিশিয়ালি গ্রহণ করে আরেকটি গৃহীত কপির অনুলিপি দেবে না।

'আমাদের তথ্যভান্ডার সবার জন্য উন্মুক্ত। দরখাস্ত লাগবে না। আমরা যতটুকু পারি এমনিতেই তথ্য দেব,' বললেন কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

অগত্যা আমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলো। ঘণ্টা খানেক কর্তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে বের হওয়ার সময় সরাসরি গেলাম অভ্যর্থনা কক্ষে। পিয়নকে বললাম, কর্তা এটা অফিশিয়ালি জমা রাখতে বলেছেন। অবশেষে কাজ হলো।

বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থায় মুখোমুখি হলাম আরও ভয়াবহ প্রশ্নের এবং সেটা অবশ্যই আমার উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। না হলে লিখিত দরখাস্ত করছি কেন!

'আমার জীবনের প্রথম এই রকমভাবে লিখিত প্রশ্ন পেলাম। আপনিই একমাত্র বিশেষ সাংবাদিক যে লিখিতভাবে জানতে চায়,' বললেন মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্মকর্তা।

সাতটি প্রতিষ্ঠানে আমি সশরীরে গেলাম দরখাস্ত নিয়ে। সবাই বিরক্ত হলেন এবং অবশিষ্ট দুটি– স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত দিলাম লোক মারফত। মন্ত্রণালয় আমার দরখাস্ত পেয়েছিল, তার প্রমাণ আমার কাছের রিসিভ করা কপি, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো দিন একটি শব্দও শুনিনি।

মোটামুটি কাহিল হয়ে গেলাম দরখাস্ত করেই। ভাবলাম, ২০ দিনের যে প্রাথমিক সময়সীমা রাখা হয়েছে উত্তর দেওয়ার জন্য তা যুক্তিযুক্ত। কাহিল সাংবাদিক একটু শ্বাস নেওয়ার সময় পাবে। ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসনের জনসংযোগ কর্মকর্তাও অভিমান করে বসে আছেন, তার কাছে জানতে না চেয়ে লিখিত দরখাস্ত করায়। পুলিশ প্রশাসনও উত্তর দেয়নি কোনো দিন।

ভাবলাম, আমাদের দেশে পত্রিকা অফিসগুলোতে সংবাদের জন্য যে তাড়াহুড়া, তাতে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে প্রতিবেদন তৈরি খুবই কষ্টসাধ্য কাজ হবে সাংবাদিকের জন্য। সৌভাগ্যবশত আমি *ডেইলি স্টার*-এ কাজ করছি, যেখানে প্রতিবেদন তৈরিতে বিলম্ব হলে তার কারণ ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। আমার পত্রিকা আমাকে সময় দিল। এই দরখাস্ত করার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে অন্য অ্যাসাইনমেন্টও করতে হলো আমার বিটের ওপর। শুধু বিটের অ্যাসাইনমেন্ট, কিছু বিশেষ রিপোর্ট করতে থাকলাম আর খোঁজ নিতে থাকলাম তথ্য অধিকার আইনে করা তথ্যগুলো কবে পাব। তথ্য অধিকার আইনে প্রতিবেদন করার আরেকটি বড় বাধা হলো দরখাস্তটি ঠিকমতো করতে না পারা। দরখাস্তটি হতে হবে নির্দিষ্ট, যাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কোনো ফাঁকফোকর বের করে তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানাতে না পারে। আইন কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যক তথ্যগুলোও অবশ্যই থাকতে হবে দরখাস্তে। নতুবা সংশ্লিষ্ট সংস্থা অথবা তথ্য কমিশন বলবে দরখাস্ত অসম্পূর্ণ এবং অগ্রহণযোগ্য।

আমার দরখাস্তটির কৌশলগত বিষয়গুলোতে সাহায্য করে রালফ ফ্রামোলিনো। মাঝে মাঝে আমি যখন দীর্ঘসূত্রতার পাকে ডুবে যেতে থাকতাম, তখন ফ্রামোলিনো উৎসাহ দিতেন আর বলতেন, সে বোধ হয় আমার সবচেয়ে অপছন্দের ব্যক্তি, যেহেতু সে একই বিষয়ে আমাকে বিরক্ত করে বারবার। শুধু রালফই নন, আমরা যারা এই টিমে কাজ করছি, সবাই একদিন একসঙ্গে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার এক্সপার্টদের সঙ্গে

বললাম। এমআরডিআই তথ্য অধিকার বিশেষজ্ঞ অনন্য রায়হান ও তানজিব-উল আলম, যিনি আইনটি ড্রাফট করেছিলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ করে দিল। যা-ই হোক, আমার দরখাস্তে কৌশলগত ত্রুটি তেমন ছিল না বলেই মনে হয়, যেহেতু কোনো সংস্থা বা তথ্য কমিশন কেউই দরখাস্তে কোনো ফাঁকফোকর এখন পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। *ডেইলি স্টার*-এর বার্তা সম্পাদক জিয়াউল হক স্বপন সব সময় আমার কাজের খেয়াল রাখতেন। সমস্যা হলে তিনি আমাকে বুদ্ধি দেন এবং অফিস তাকে আমার কাজের দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। একজন সাংবাদিকের জন্য তথ্য অধিকার আইনে কাজ করতে অফিসের অভ্যন্তরে একজন সরাসরি তত্ত্বাবধায়ক অনস্বীকার্য।

প্রথম ধাপে নির্ধারিত ২০ দিনে শুধু জয়েন্ট স্টক কোম্পানি কিছু তথ্য দিল। বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা অনেক আলাপের পরে অলিখিতভাবে জানাল, তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। পুলিশ প্রশাসন, বাণিজ্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থাকল নির্বাক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পাত্তাই দিল না। কারণ তারা আইনের আওতামুক্ত। ওষুধ প্রশাসন বলতে থাকল মন্ত্রণালয় কিছু জানায়নি এখনো। কাস্টমস শুধু আশ্বাস দিয়ে চলল পুরো সময় আর এসেনশিয়াল ড্রাগ কোম্পানি জানাল না কিছুই।

এর মধ্যেই একদিন মনে হলো একটি সংস্থা হিসাব থেকে বাদ পড়ে গেছে। সংস্থাটি হলো মহাহিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়। আমি ওষুধ প্রশাসনের অডিট রিপোর্টের জন্য মহাহিসাব-নিরীক্ষকের অফিসে আবেদন করলাম। মহা-হিসাবনিরীক্ষকের অফিস একদম শেষ সময়ে জানাল, তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। যতটুকু অগ্রগতি হলো তা নির্ধারিত সময়ের শেষ সপ্তাহে। প্রথম দুই সপ্তাহ কেউ কোনো শব্দও করেনি।

আইন অনুযায়ী আমি দ্বিতীয় ধাপে অগ্রসর হলাম। এইবার সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বরাবর আপিল করলাম।

আপিলগুলো করলাম সব অনলাইনে। সংযুক্তি থাকল আমার আগের দরখাস্তের অনুলিপিগুলো। আপিল করলাম ছয়টি। জানুয়ারির ৩ ও ৫ তারিখে আপিল দাখিল করলাম। নির্ধারিত ১০ দিনেও কোনো অগ্রগতি হলো না এবং কেউ আমাকে কোনো জবাব দিল না।

শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি মার্চের প্রথমে অনলাইনে অভিযোগ করলাম তথ্য কমিশন বরাবর। প্রায় দুই সপ্তাহেও তথ্য কমিশনের কোনো সাড়া না পেয়ে যখন সশরীরে উপস্থিত হলাম, কমিশন কর্মকর্তারা বললেন দরখাস্ত সঠিক নিয়মে পূরণ করা হয়নি।

তথ্য কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী আমি নির্দিষ্ট ফরমে অভিযোগ লিখে কমিশনে উপস্থিত হলাম ১৩ মার্চ ২০১১।

এবার একটু কষ্ট হলো, যখন তথ্য কমিশনের এক কর্মকর্তা বললেন, এই দরখাস্তও

গ্রহণ করা যাবে না, কারণ আমার দরখাস্ত দেখতে কমিশনের বইয়ে ছাপানো দরখাস্তের মতো হয়নি। আমি জানতে চাইলাম, আইনের কোন ধারাতে দরখাস্ত দেখতে একই রকম হতে হবে বলা আছে, যখন সব প্রয়োজনীয় তথ্যই আমার অভিযোগে আছে।

'আমরা আপনাদের সাহায্য করার জন্যই এখানে আছি, তর্ক করার জন্য নয়' বলেই কর্মকর্তা আমাকে নিয়ে গেলেন প্রধান তথ্য কমিশনারের কক্ষে।

প্রধান তথ্য কমিশনার আমাকে জানালেন, আমার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বললেন যে আমার অভিযোগপত্র দেখতে তথ্য কমিশনের নির্দিষ্ট অভিযোগপত্রের মতো হয়নি। উনি আমাকে আরও বললেন, সত্যিকার অর্থে আমার কোনো দরখাস্তই, সেই গত বছরের নভেম্বর থেকে শুরু করা, গ্রহণযোগ্য নয়। পরে তিনি বললেন, 'আপনাকে এখন যা করতে হবে, তা হচ্ছে সবগুলো দরখাস্ত গোড়া থেকে করে আসতে হবে আবার।' আমি যখন বললাম, সব ঠিক থাকতেও আমাকে আবার একই কাজ করতে হলে আমার সময়ের অনেক অপচয় হবে। উনি বললেন, 'আইনের বাইরে আমি যেতে পারব না।'

শেষ চেষ্টায় আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আইন কর্তৃক নির্ধারিত সব তথ্যই আমার এ লিখিত পত্রগুলোতে ছিল। হয়তো বা দেখতে হুবহু এক রকমের নয় কিন্তু প্রয়োজনীয় সব তথ্য আছে।

'তথ্য পাওয়ার জন্য আইনগত যে ধাপ আছে তা পূরণ করে আপনাকে তথ্য পেতে হবে। আইন আমার ইচ্ছামতো চলে না,' বললেন প্রধান তথ্য কমিশনার। পরে আমি জানতে চাইলাম, আইনের ঠিক কোন ধারায় বলা আছে যে দরখাস্ত দেখতে হুবহু কমিশনের বলে দেয়া ফরমের মতো হতে হবে। আর যারা সুবিধাবঞ্চিত এবং গ্রামে থাকে, যারা কোনো দিন তথ্য কমিশনের ফরম দেখেনি, তারা কীভাবে তথ্য চাইবে?

১৪ মার্চ আমি যখন হতাশায় ডুবে ছিলাম, তখন ছয়টি চিঠি পেলাম তথ্য কমিশনের কাছ থেকে। জানতে পারলাম আমি ঠিক ছিলাম এবং তথ্য কমিশন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

অবশেষে তার ১০ দিন পর চারটি সংস্থা লিখিতভাবে উত্তর দেয়, যেখানে সুকৌশলে সবাই বলার চেষ্টা করেছে প্রার্থিত তথ্য তাদের কারও কাছেই নেই। শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তথ্য কমিশনের আদেশের গুরুত্ব দেয়নি। পুলিশের প্রধান কার্যালয়ও তথ্য কমিশনকে গুরুত্ব দেয়নি।

তথ্য কমিশনের আদেশ জারি হয়েছে দুই মাসেরও বেশি। আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তির জন্য আবারও কমিশন বরাবর দরখাস্ত করা, যেহেতু তারা আংশিক, অসম্পূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে কোনো তথ্যই দেয়নি।

শেষ উৎসাহটা পেলাম এমআরডিআই ভারতের আউটলুক পত্রিকার সাংবাদিক সৈকত

দত্তকে আনলেন আমাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য। সৈকত দত্ত দেখিয়েছেন তথ্য অধিকার আইনের সুযোগ নিয়ে করা প্রতিবেদন কত নিখুঁত ও কার্যকরী হতে পারে, যা কিনা পদচ্যুত করতে পারে রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান মন্ত্রিদেরও। তিনি দেখালেন, কীভাবে তথ্য অধিকার আইন কাজে আসতে পারে একজন সাংবাদিকের প্রতি মুহূর্তে, এমনকি তখনো যখন একজন সাংবাদিক সরষে ফুল দেখে প্রতিবেদনের অভাবে।

Spurious Medicine

Emran Hossain, Staff Reporter, The Daily Star

The Beginning

I was working on an investigative report in 2009. It was about deaths of 2,700 children in 1991-92 period when five medicine manufacturing units were confiscated for producing and marketing spurious paracetamol. Since then I remained curious to know further details about that incident. Last year my office assigned me and my colleague Porimol Palma to work under a special project on Right to Information (RTI) Act under the aegis of non-government media research initiative MRDI. In the very first meeting at a city hotel, journalist and journalism trainer Ralph Frammolino explained to us how the newly enacted RTI Act could come handy in our work. I decided instantly that it was the tool I was going to use to probe into the mystery behind the deaths of so many children.

My Experience

It has been more than a year after the RTI Act enactment when I met the Drug Administration Director General on November 4, 2010 with an application under RTI Act seeking info about the 1991-92 child deaths due to spurious paracetamol. And to my utter surprise the DG picked up an argument with me on the very basic premise of my seeking information saying that how would he know whether the RTI Act was passed at all. I took seconds in using his computer and surfing in the internet I showed him that the government had passed the act back in 2009.

Then the DG grumbled how would they know, if not informed by serving any notice, about when government was enacting one law or the other in the parliament. Remaining oblivious about the RTI Act and its scope the DG arbitrarily forwarded my application to the ministry concerned telling me that he would require approval of the ministry in divulging info to me. He didn't even know that under RTI Act ministerial permission was not required to response to my queries.

In consultation with RTI expert Ralph Frammolino, I prepared a list of nine government and non-government authorities on the basis of probability where I could approach for seeking info related to the child deaths. Those included health ministry, police administration, commerce ministry and Bangladesh Standard and Testing Institute (BSTI). I filed five RTI applications on November 4, 2010, two on November 7, 2010, and two more on November 22, 2010.

None of the nine institutions I approached had till then any designated official under the requirement of RTI Act to entertain such queries. So I had to file the applications to the respective institution heads. Most of them, at that time, were still ignorant about the RTI Act.

I had peculiar experiences while submitting the info pleas at Joint Stock Company and BSTI. At Joint Stock Company the official concerned, in no way, would agree to give me a signed received copy of the application claiming that "here our info are open to all and no application is required." I had to be a little naughty and bit dishonest. As I came out of the official's place, I asked the office

peon outside to keep a copy of the application and give me a signed copy telling him that the boss (official) had said so. It worked.

At BSTI the official concerned was little skeptic about the very intention of my seeking info in writing. He said it was me the first journalist he ever encountered who is making a written application for some information.

I tendered applications personally in seven of the nine intuitions, while dispatched two others (to health and home ministries) by messengers. I've got received copies of those but never heard anything from them till now.

Ralph Frammolino helped me out in preparing the RTI applications, which have got some degree of technicalities. Besides, MRDI created scope for me to draw from the experiences of RTI experts like Ananya Raihan and Barrister Tanjib-ul Alam. I got the mentoring of my news editor Ziaul Haq Swapan.

Within the 20-day stipulated time only the Joint Stock Company furnished me with some info. BSTI unofficially informed me that the queries I posed to them were irrelevant. Police administration and ministries of commerce and home remained unmoved. World Health Organization hardly cared as they are out of the purview of RTI Act. Drug Administration got an easy excuse that they were still waiting for ministry's nod. Customs authority kept continuing with their words of assurance only and no information while Essential Drug Company didn't care at all.

Then one day it crept into my mind that another important institution remained left out. I applied for audit report of Drug Administration from the office of CAG. But they told me that there was no info regarding that to them.

I stepped forward to the next stage when I appealed to the higher authorities of six of those institutions on January 3 and 5, 2011 seeking redress by attaching with my appeals the copies of original applications. Yet after exhausting the stipulated 10 days, none of them replied to me.

As a last resort, I complained online to the Information Commission in early March, 2011. Getting no response whatsoever as I went to the Commission over a week later, I was told that the appeal form that I tendered was not filled up properly.

On March 13, 2011 I went to the Commission again – this time with properly filled up appeal. But to my surprise an official there again said that my one was not yet looking like the appeal example set in the law book. I tried to tell him that all the necessary info are there in my appeal but he wouldn't listen.

The Chief Information Commissioner told me that not only the appeal before them but also all my previous applications to different institutions lacked in right procedure as those did not look like the prescribed format laid out in the RTI Act. He advised me to do the exercise right from the beginning afresh. I argued that all were carried out in a proper manner and if I've to repeat the same exercise it'll cost my precious time.

I was awestricken when I received six letters from the Information Commission on March 14, 2011 letting me know that I was right and the Commission has asked the institutions concerned (where I pleaded for info) to take necessary steps.

Ten days later four of the institutions gave me replies in writing but they tactfully avoided giving me answer to my queries claiming that they didn't possess those information. Ministries of health and home affairs and the police headquarters didn't respond at all.

It has been two months now that the Information Commission had directed the institutions to furnish me with the information. None of them fully obliged. Some gave partial, half-baked information, some ignored altogether. So my logical next step would be applying again to the Information Commission, this time, asking for punishments to the non-complying institutions.

I didn't give up hope. Courtesy MRDI I got fresh encouragement from a recent encounter with Saikat Datta, a journalist of Indian magazine Outlook, who described how pursuing RTI he could come up with good investigative reports.

রহস্যজনক ফান্ড

পরিমল পালমা, সিনিয়র রিপোর্টার, দি ডেইলি স্টার

আমার ভাবনা

ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডের অপব্যবহার নিয়ে অভিবাসী শ্রমিক এবং তাদের নিয়ে কাজ করে, এমন অনেকের মধ্যে বহুদিন ধরে নানা প্রশ্ন কাজ করছে। রিপোর্টিং করতে গিয়ে অনেকের মতো আমারও মনে হয়েছে, এই ফান্ড শ্রমিকদের সত্যিকার কল্যাণে কাজ করছে না। আমি নিজে তাই জনশক্তি কর্মসংস্থান ব্যুরোর দু-একজন কর্মকর্তার কাছে জানতে চেয়েছি, কোন কোন খাতে কীভাবে এই ফান্ডটি ব্যবহৃত হয়েছে। তারা বলেছে, ব্যুরোর পরিচালক (কল্যাণ) তা ভালো বলতে পারবেন। আমি একবার-দুবার পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে জানতেও চেয়েছি। উনি বলেছেন, এ ব্যাপারে জানতে সরাসরি মহাপরিচালকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এটা ২০০৮-০৯ সালের কথা বলছি। নানা কাজের ব্যস্ততায় তখন খুব লেগে থাকতে পারিনি।

তথ্য অধিকার অভিযান

এর মাঝে গত বছরের শেষের দিকে একদিন জানতে পারলাম, এমআরডিআই (গণমাধ্যম নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংগঠন) তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে রিপোর্টারদের সঙ্গে কাজ করতে চায়। সম্পাদকের অনুমোদনে নিউজ রুম থেকে আমি, আমার সহকর্মী ইমরান হোসেন ও আমাদের মেনটর হিসেবে বার্তা সম্পাদক জিয়াউল হক স্বপন একটি টিম হিসেবে তথ্য অধিকার অভিযানে যোগ দিলাম। সে সময় জানতে পারি, আমেরিকার সাংবাদিক রালফ ফ্রেমোলিনো থাকবেন এই কাজের কনসালট্যান্ট হিসেবে। রালফ *ডেইলি স্টার*-এর সবার

খুবই কাছের মানুষ, কারণ গত বছর তিনি একটা দীর্ঘসময় নিউজ রুমে আমাদের সঙ্গে ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন। এই অনুসন্ধানী সাংবাদিক একই সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন বিশেষজ্ঞও। তিনি ঢাকাতে এমআরডিআই-এর সঙ্গে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের কাজ করছেন।

যখন রালফ এবং এমআরডিআই-এর মুকুর ভাই আমাদের সঙ্গে প্রথম মিটিংয়ে বসলেন, তখনই মনে হলো এই আইনের আওতায় আমি লিখিতভাবেই ফান্ডের ব্যাপারে জনশক্তি ব্যুরোর কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে পারি। সেই চিন্তা থেকে আমি প্রথমেই আবেদন করলাম প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর। সচিব হলেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। এখানে লক্ষণীয়, মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিকার আইনের অধীনে যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তার কাছেই আমি প্রথম আবেদন করতে যাই। তবে তিনি আমাকে সচিব বরাবর আবেদন করার পরামর্শ দেন।

২০১০ সালে ১১ নভেম্বর আমি যথারীতি আবেদন করি সচিব বরাবর। এর তিন দিন পর সচিবের দপ্তর থেকে আমাকে ই-মেইল করা হয়, সচিবের পক্ষ থেকে আমাকে আমার আবেদনকৃত তথ্য বা দলিল সরবারাহ করা সম্ভব নয়। কারণ হিসেবে আমাকে বলা হয়, জনশক্তি ব্যুরোর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হয় বিধায় সেখানে যাবতীয় রেকর্ড-পত্রাদি সংরক্ষণ করা হয়। ব্যুরো কর্তৃক একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেখানে নিয়োগ করা আছে বিধায় আমাকে জনশক্তি ব্যুরোতে আবেদন করতে বলা হয়।

অতএব, আমি দ্বারস্থ হই জনশক্তি ব্যুরো বরাবর। একজন পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হই যে সেখানে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন। সেই মোতাবেক আমি আবেদনপত্র লিখে হাজির হই ব্যুরো বরাবর। ২০০৬ থেকে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কল্যাণ তহবিলের সব ধরনের লেনদেন, হিসাবপত্রের দলিল, রিসিপ্ট, সরকারি বা বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার চিঠিপত্র লেনদেন, এই ফান্ডের অধীনে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার অবস্থা– এসব তথ্য/দলিল দেখতে চাই। আমি উল্লেখ করি, যদি প্রয়োজন হয়, আমি তা ফটোকপির জন্য আবেদন করব এবং তার জন্য যে খরচ হয়, তা দিতে বাধ্য থাকব।

যাহোক, ২২ নভেম্বর ২০১০ আমি ব্যুরোতে গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দেখা পাইনি। তার দপ্তরের একজন বলেন, ম্যাডাম ওপরে গেছেন। কিছুক্ষণ পর অপেক্ষা করার পর জানতে চাইলে বলেন, উনি হয়তো বাসায় চলে গেছেন। অতএব আমি তার দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সহকারীর কাছে আবেদনপত্র জমা দিয়ে গ্রহণকারীর স্বাক্ষরসহ আবেদনের অনুলিপি নিয়ে আসি। দুই দিন পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে ফোন করে জানতে চাই, তিনি আবেদনপত্র পেয়েছেন কি না। উনি জানান, আবেদনপত্র তার হস্তগত হয়েছে এবং তিনি তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি আশ্বস্ত হই।

এর মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আর কোনো যোগাযোগ করেননি। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, আমি ২০ দিন পর খোঁজ নিই। কিন্তু বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। অফিসে ফোন করলে বলা হয়, তিনি ছুটিতে আছেন অথবা অফিসের বাইরে আছেন। বাসায় ফোন দিলে বলা হয় উনি অফিসে গেছেন অথবা বাইরে গেছেন। মোবাইলে ফোন দিলে উনি ধরেন না। এভাবে আমি অন্তত দুই সপ্তাহ ফোন করেছি। ব্যর্থ হয়ে আমি জনশক্তি ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর একটি ই-মেইল করি, তাতে আমি বলি যে আমি একটি আবেদন করে তার কোনো উত্তর পাচ্ছি না। সুতরাং আপনার দ্বারস্থ হলাম। এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলে কোনো উত্তর না পেয়ে আমি মহাপরিচালককে ফোন করি। জানতে চাই উনি আমার ই-মেইল পেয়েছেন কি না। উনি বলেন, কোনো ই-মেইল উনি পাননি। তবে আমাকে আশ্বস্ত করেন, উনি ব্যাপারটি দেখবেন। কিন্তু সেই দেখা আর হয় না। আমি আবারও ফোন দিই সপ্তাহ খানেক পরে। একই রকম উত্তর দেন। আমি হতাশ হই।

জানুয়ারির তিন তারিখের এক বিকেলে হাজির হই তার দপ্তরে। নিজের হাতে তুলে দিই আবেদনখানা। বলি, এক কপিতে গ্রহণের স্বাক্ষর করে দিতে। তিনি বলেন, তিনি নিজে ব্যাপারটি দেখবেন। তার সঙ্গে আরেকজন পরিচালক ছিলেন। আমি দু-তিনবার অনুরোধ করার পরও উনি স্বাক্ষর না করায় পরিচালক বলেন যে মহাপরিচালক নিজে যেহেতু দেখবেন, তাই আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। সন্দেহ থাকার পরও আমি কিছুটা আশান্বিত হওয়ার চেষ্টা করি। সপ্তাহ খানেক পর তাকে ফোন দিই, তিনি ধরেন না। আবারও ফোন দিই, ধরেন না। এভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ পার হয়ে যায়।

তখন আমি রালফ ও আমার মেন্টরের সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ করি। আমাকে বলা হলো, আমার জন্য এখন পথ খোলা আছে একমাত্র তথ্য কমিশনে যাওয়া। দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেহেতু আমার আবেদনের ফলোআপ করতে হয়, একেবারে ঠিক সময়মতো সব আবেদন জমা বা তার খোঁজ নেয়া কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে। যাহোক, তার পরও ফলোআপ না করে তো উপায় নেই। কারণ, তাতে তো আমার ধৈর্যের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারব না। তবে এ ব্যাপারে আমাকে সার্বক্ষণিক অণুপ্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন রালফ ।

সিদ্ধান্ত নিলাম, তথ্য কমিশনে যাব। আপিল আবেদন লিখে গেলাম কমিশনে। দেখা হলো কমিশনের সচিবের সঙ্গে। বললাম, আমার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কাহিনি। উনি বললেন, জনশক্তি ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আবেদনের কপিতে যেহেতু কোনো গ্রহণ স্বাক্ষর নেই, তাই তথ্য কমিশন বরাবর আপিল গ্রহণযোগ্য হবে না। উনি আমাকে পুনরায় ব্যুরো বরাবর আবেদন করতে পরামর্শ দিলেন। ফলে আমি আবার আবেদন করলাম মহাপরিচালক বরাবর ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে। এবার আর তার সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করলাম না। তার পিএসকে দিয়ে গ্রহণ স্বাক্ষর করিয়ে আবেদন কপি নিয়ে আসলাম। এরপর দীর্ঘ প্রায় এক মাস পার হয়ে যায়। কোনো উত্তর না পেয়ে এবার আবেদন করি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর

মার্চের ২০ তারিখে। আবেদনে আমি বলি, আমি যদি আমার আবেদনকৃত দলিলপত্র না পাই, তথ্য কমিশনে যেতে বাধ্য হব।

সচিব পরদিন সকালেই আমাকে ফোন দেন, বলেন ওনার সঙ্গে দেখা করতে। দুই দিন পরই আমি দেখা করি। সচিব জানতে চান, আমি যেসব দলিলের জন্য আবেদন করেছি, তা তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী পেতে পারি কি না। আমি আইনের বই দেখিয়ে বলি, এটা আমার অধিকার। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জনশক্তি ব্যুরোর পরিচালককে (কল্যাণ) ফোন করে বলেন, আমি যা যা চেয়েছি এবং যা যা ব্যুরো দিতে পারে তা যেন দিয়ে দেন। উনি আমাকেও বলেন পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। সেই কথামতো আমি পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎও করি। পরিচালক বলেন, আমি যে আবেদন করেছি, তার আওতা অনেক বড় এবং কী চেয়েছি তা সুনির্দিষ্ট নয়। আমি বলি, আমি যা চেয়েছি, তা খুবই স্পষ্ট। তিনি বলেন আমি যা চেয়েছি, তার জন্য অনেক কাগজপত্র ঘাঁটতে হবে, সুতরাং তা দেয়া তার পক্ষে অসম্ভব। আমি তা লিখিত দিতে বলি। উনি তাও দিতে রাজি হন না এবং আমাকে বলেন সুনির্দিষ্টভাবে আমি কী চাই তা আবেদনে উল্লেখ করতে। আমি বলি, এ ব্যাপারে আমার অফিসে আলাপ করতে হবে। এ কথা বলে আমি চলে আসি।

পরে আমি তাকে মে মাসের আট তারিখে একটি ই-মেইল করি, যাতে আমি বলি, আপনি যেহেতু মনে করছেন পাঁচ বছরের কাগজপত্র আমাকে প্রদান করা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাহলে আমাকে কল্যাণ ফান্ডের কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট শুধু ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের সব দলিল প্রদান করুন। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেও উনি কোনো জবাব দেন না। আমি বাধ্য হয়ে ওনাকে ফোন দিই। পরিচালক (কল্যাণ) আমাকে আগেরবার যেসব কথা বলেছিলেন, সেসব কথারই পুনরাবৃত্তি করেন। আমি আমার অবস্থানে ঠিক থাকি এবং বলি, আমি যা চেয়েছি, তা খুবই সুস্পষ্ট। তাকে এটাও মনে করিয়ে দিই যে, আমি ছয় মাস যাবৎ আবেদন করলেও আমার আবেদনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এতে আমি অপমানিত হয়েছি। কারণ আমাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশও করেন। কিন্তু আমি বলি, এটা দুঃখ প্রকাশের ব্যাপার নয়। এটা প্রফেশনাল ব্যাপার এবং জনগণের অধিকারের ব্যাপার।

যাহোক, এর মধ্যে ১৯ মে আমি তথ্য কমিশন বরাবর একটি আবেদন নিয়ে কমিশনের সচিবের কক্ষে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে জানান, প্রধান তথ্য কমিশনার সেই দিনই বিদেশে যাচ্ছিলেন এবং তিনি সে উদ্দেশ্যে অফিসের বাইরে চলে গেছেন। অথচ, আপিল গ্রহণের জন্য তার স্বাক্ষর লাগবে। উনি আমাকে জুনের এক তারিখের পর আপিল করার জন্য বলেন। আমি জানতে চাই, অন্য কেউ গ্রহণ করে রাখলে হবে কি না। উনি নেতিবাচক উত্তর দেন। রিপোর্টারদের প্রশ্ন করার অভ্যাস থেকেই বোধ হয় আমি প্রশ্ন করে বসি, আচ্ছা, যদি কেউ গ্রাম থেকে আসে, তাহলে তার আপিল গৃহীত হবে কি না, নাকি তিনি গ্রামে ফিরে যাবেন। তিনি মৃদু রেগে গিয়ে প্রধান তথ্য কমিশনারের কেরানির কাছে আমার আপিল জমা দিয়ে দিতে বলেন। আমি কোনো

কেরানি না পেয়ে, প্রশাসন বিভাগের এক কর্মকর্তার কাছে আমার আবেদন জমা দিয়ে আসি।

এরই মধ্যে গত ২১ মে জনশক্তি ব্যুরো থেকে কল্যাণ ফান্ডের একজন জনসংযোগ কর্মকর্তা ফোন করেন। জানতে চান, আমি আসলে কী কী কাগজপত্র চাই। আমি বললাম। সঙ্গে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও বললাম। উনি বললেন আমার চাহিদা তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বলবেন। তাই অপেক্ষায় রইলাম দেখতে, কী ঘটে তথ্য অধিকার আইনে একজন সাংবাদিকের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে।

আমার উপলব্ধি

১. আমি প্রথমেই একটি ভুল করেছি। তা হলো, শুরুতেই আমাকে আবেদন করার দরকার ছিল জনশক্তি ব্যুরোর কাছে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করে আমার সময় নষ্ট হয়েছে।

২. সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে সরাসরি ব্যুরোর মহাপরিচালকের কাছে আবেদন জমা দেওয়া। ফলে উনি সুযোগ পেয়েছেন আমাকে অবজ্ঞা করার। আমার উচিত ছিল তার পিএস-এর কাছে আপিল আবেদন জমা দিয়ে স্বাক্ষর গ্রহণ করে অনুলিপি নিয়ে আসা। তবে মহাপরিচালক আমার আবেদনকে যেভাবে অবজ্ঞা করেছেন, তা সত্যিই অগ্রহণযোগ্য। এতে বারবার আমার একটি কথা মনে হয়েছে, আমি একজন সাংবাদিক হয়ে যদি এমন অবজ্ঞার শিকার হতে পারি, লাখ লাখ শ্রমিক, যারা বিদেশে যান তারা কী ধরনের সেবা পান এ প্রতিষ্ঠান থেকে।

৩. আরেকটি ব্যাপার আমার মনে হয়েছে যে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ক্ষমতায় এসে সব অফিস-আদালতে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট প্রদান এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাহলে আমার প্রশ্ন, ব্যুরোর মহাপরিচালক কীভাবে দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও বলতে পারেন যে তিনি আমার কোনো ই-মেইল পাননি, যেখানে আমার ই-মেইল আইডিতে প্রমাণ আছে যে ই-মেইল নিশ্চিতভাবে তার ই-মেইল বক্সে পৌঁছেছে?

৪. সর্বশেষ প্রবাসী কল্যাণ সচিবকে আবেদন করার পর উনি যখন আমাকে বললেন ব্যুরোর পরিচালক (কল্যাণ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, আমি হয়তো তা নাও করতে পারতাম। কারণ, আইন অনুযায়ী সচিবের দপ্তর আমার জন্য তথ্য জোগাড় করার ব্যবস্থা করার কথা বা তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়ার কথা। তবু, আমি সচিবের কথায় ব্যুরোর পরিচালক (কল্যাণ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এই ভেবে যে আমি এই সেক্টর নিয়ে লেখালেখি করি, তাই খুব বেশি দর-কষাকষির কোনো ব্যাপার ঘটুক, তা আমি চাইনি। এ

ব্যাপারটা আমি সচেতনভাবে চিন্তা না করলেও হয়তো অবচেতনভাবে করেছি।

৫. তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি ধাপে আমি সময়মতো আবেদন করলে কোনো কর্তৃপক্ষ যদি তথ্য নাও দেয় এবং আমাকে যদি তথ্য কমিশনে যেতেও হয়, তার জন্য তিন-চার মাস সময় যথেষ্ট। আমিও একটি কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়ে তার কোনো ধাপেই পাইনি, আমার সর্বোচ্চ চার মাস লাগার কথা ছিল তথ্য কমিশন পর্যন্ত আপিল করার জন্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে আমার তথ্য কমিশনে যেতে প্রায় ছয় মাস লেগে যায়। এর প্রধানতম কারণ, আমি বলব মানসিকভাবে শক্ত না থাকা। অর্থাৎ, আবেদনের প্রতিটি ধাপে আমি যদি ভাবতে পারতাম যে ঠিক আছে, আমি তথ্য পাইনি, সুতরাং আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর দিনই পরবর্তী ধাপে আবেদন করব, তাহলে আমি কম সময়ের মধ্যেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারতাম। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে যদিও অফিস আমার আবেদনের ব্যাপারে জানত, আমি প্রতিবার প্রতি ধাপে আবেদন করার জন্য অফিসকে বলব, তাতে কিছুটা সংশয় কাজ করত। এর অন্যতম কারণ হলো প্রতিদিনের আমার বিটের যেসব রিপোর্ট, তা তো আমাকেই করতে হবে। এ ব্যাপারে তো আমি অন্যদের ঘাড়ে আমার কাজ চাপিয়ে দিতে পারি না। যদিও এ ব্যাপারে অফিস আমাকে কিছু বলেনি, আমি নিজে থেকেই তা অনুভব করেছি। সম্ভবত এটি আমার জন্য ভুল ছিল।

৬. অফিসে প্রধান প্রতিবেদক বা বার্তা সম্পাদক আমার আবেদনের ব্যাপারে জানতেন। এবং এ ব্যাপারে আমাকে অবশ্যই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে, তাদেরও এ ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া ছাড়া প্রয়োজনীয় বাস্তব সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। কারণ, কাজ তো আমাকেই করতে হবে। এবং আমার বিটের প্রতিবেদন তো আমাকেই করতে হবে। সেই চাপ আমি নিজে নিজেই নিয়ে নিয়েছি। এখানে ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারটা বেশ জটিল। তবে অফিসের পক্ষ থেকে এ আইন ব্যবহার করে রিপোর্টিং করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এমনকি ভারতে এই আইন ব্যবহার করে প্রচুর অনুসন্ধানী রিপোর্ট করেছেন, এমন একজন সাংবাদিক সৈকত দত্তকে অফিসে এনে তার অভিজ্ঞতা শোনারও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ভারতীয় আউটলুক পত্রিকায় খাদ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রশাসনের দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করে তিনি গোটা ভারতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন।

শেষ কথা

আমরা রিপোর্টিং করতে গিয়ে কোনো তথ্য একটু স্পর্শকাতর মনে হলেই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাত দিয়ে খবর লিখে ফেলি। তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তথ্য সঠিক হলেও, ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু তা থেকে নিজে বাঁচতে গিয়ে এবং সোর্সকে বাঁচাতে গিয়ে অনেক সময় পাঠককে ভুল তথ্যও দিতে পারি।

তথ্য অধিকার আইন এমনই একটি আইন, যাতে আমি অনেক দুর্নীতি-অনিয়মের খবরও পেতে পারি এবং যা হবে প্রমাণসাপেক্ষে, যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর। এখানে সবকিছু স্বচ্ছ। কোনো নাম প্রকাশের অনিচ্ছার ব্যাপার নেই। তবে এই সংস্কৃতিটা পরিবর্তন হতে একটু সময় লাগবে। পরিবর্তন কোনোদিনই হবে না, যদি আমরা সাংবাদিকেরা ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত যারা জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত, তারা এ আইন প্রয়োগের ব্যাপারে তৎপর না হই। অস্বচ্ছতার জাল ভাঙার জন্য এ আইন পরম আশীর্বাদ। দক্ষভাবে তা প্রয়োগ করতে না পারলে আমাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন কিছুই উন্নত হবে না।

The Mysterious Fund

Porimol Palma, Seniro Reporter, The Daily Star

My Thoughts

There have always been some doubts among the migrant workers and other stakeholders about the proper utilization of Wage Earners Welfare Fund. In doing my job as a reporter, at times, I did also wonder whether the fund was really being spent to the benefits of the migrant workers. I tried to get an answer to that from the officials concerned at the BMET but never did pursue it very strongly.

Adventure of RTI

Then sometime in late 2010 MRDI came up with proposal to The Daily Star to do some exercise together on the issue of Right to Information (RTI) Act. My office (The Daily Star) wanted me and my colleague Emran Hossain to do the job under the mentorship of one of our news editors Ziaul Haq Swapan. US journalist and trainer Ralph

Frammolino also joined the party as a consultant. He has been with us for sometime as a trainer at our newsroom. Besides, Ralph is an expert on RTI.

It crept into my mind at the very onset of this RTI exercise that why I don't apply the RTI tools in seeking the Welfare Fund related info from BMET. I first approached an official-designated (under RTI Act) at the ministry but he directed me to the Secretary of the Expatriate Welfare and Overseas Employment Ministry, who happened to be ex-officio chairman of the board managing the Wage Earners' Welfare Fund.

Within three days of my application to the Secretary seeking the Fund info, I was advised through an email message that I should direct my application to an official-designated (under RTI Act) at BMET. In the mail I received from the ministry, Secretary argued that as the Wage Earners' Welfare Fund is run directly under the supervision of BMET all the Fund related documents/records are preserved there (BMET).

I prepared an application seeking information on usage of the Fund during the period between 2006 and 2010 and tried to submit that by hand to that designated official at BMET. On November 22, 2010 as I went to meet her, staffs there first told me that she was somewhere in the office building but outside her office room and then after sometimes I was told that she might have gone home. So I kept my application to an assistant of her office and got back from there upon taking a receipt-signed copy of my application. Two days later as I phoned her to enquire, she acknowledged receipt of the application and assured me that she had already forwarded that to authorities concerned.

Twenty days exhausted. Never did she inform me any further. So I tried in vain to reach her – each time I called her she was either out office or on leaves or busy otherwise and she wouldn't pick up her mobile. Two more weeks passed by and I could establish no communications with her whatsoever. I sent an email to the BMET Director General informing him my case. Getting no response to my mail I rang him up a week later. The DG declined of having receiving

any mail from me but assured me of looking into the matter. A week later I gave a follow-up call and he again gave me another customary assurance but for no real progress. I got very disappointed.

On January 3, 2011 I met him at his office and handed over the application to him but the DG wouldn't receive it by giving a signature, rather would just give me verbal assurance. Week later as I gave him call he wouldn't pick and it happened in the successive week too.

I sought advice from Ralph and my in-house mentor. They showed me the recourse of appealing before the Information Commission. I prepared an appeal application and went to the Information Commission but its Secretary told me that they were not going to entertain my appeal at that stage as I didn't have the signed receipt copy of my application addressed to the DG. He advised me to apply afresh to the DG and get a receipt copy. I did so on February 22, 2011 and this time didn't meet the DG rather got it received by his private secretary and made sure I got a receipt copy as well.

A month passed by yet there was no sight of any information. On March 20, 2011 I applied to the ministry's Secretary informing him also that I will be bound to seek redress at the Information Commission if I didn't get in hand the Fund documents I sought.

The very next morning I received phone call from the Secretary asking me to meet him. Two days later I went and met him. He wanted me to answer whether the info I sought for, I was entitled to get lawfully under the RTI Act. I showed him the RTI Act that says it was my right to get the info. He got convinced and instantly phoned the BMET Director (Welfare) instructing him to furnish me with all the info I sought.

As advised by the ministry Secretary, I met that Director but no luck yet. Rather the Director told me that the info I sought was of very wide-ranging in nature and not limited to any specific issue of the Welfare Fund. He said if he had to furnish me with all those info/documents he had to scan through lots of papers and it was not possible for him to do so. I requested him to give me in writing that

he was not being able to give me the info. He declined. He insisted on me to ask for any specific info and not something of wide-ranging nature.

On May 8, 2011 I mailed him (the BMET Director) to say that if he thought it was too much for him to provide me with all the info of five years (2006-2010) he could at least give me the documents dealt with the Welfare Fund activities in the year 2010 only. Getting no reply to the mail, I phoned him and he just repeated his earlier comment that I should ask for very specific info.

I took the last resort. I wanted to drop an appeal before the Information Commission on May 19, 2011 but the Commission Secretary told me that the Chief Information Commissioner was scheduled to go for a foreign trip that day and he was not available then and his signature was necessary for accepting my appeal. The Secretary advised me submit the appeal after June 01, 2011. I asked to his dismay that had someone from a remote village would have come to submit a plea then whether that would have been rejected too for the day. He asked me to drop my appeal with the clerk at the Chief Information Commissioner's office. Finding none there I submitted the appeal to an official in the administrative section.

On May 21, 2011 a public relations officer from BMET's Welfare Fund phoned me to know exactly what documents I was asking for. I answered him and also shared with him my miseries in getting the info over the last few months. He assured me of informing this to the authorities concerned. I am still waiting to see what happens at last in a journalist's pursuit to gain info under RTI.

My Realizations

1. I should have applied for info to BMET in the very first place. I wasted some time applying to the ministry first.

2. I shouldn't have applied to the BMET DG directly rather I should have submitted the application to his private secretary in the very first instance and get a signed receipt copy. Because the way the DG neglected a journalist's plea for information, I

can well imagine now how would he treat the thousands of migrant workers.

3. I also wonder how come a public servant of DG's stature can claim of not receiving email two weeks after it was sent (with proof of the message being sent to his mail address). And this happens at a time when a government imparts training to its officials to use all e-gadgets with the target of building a 'Digital Bangladesh.'

4. It was a bitter experience that even after meeting personally I didn't get the info from the BMET Director (Welfare) though he was asked by the ministry Secretary to cooperate. I could well have not met him as, as per law they are the ones who are obliged to provide me the info. Yet considering not straining the good rapport with the officials in my beat (the area/ministry/bureau I cover as a reporter) I, very consciously, didn't go for any bargain.

5. I should have followed the every steps of RTI in a timely fashion lest I lost precious few months in the process of pursuing for info from one step to other. It took me longer time than normal to seek redress at Information Commission because I didn't always anticipated and planned in advance the subsequent steps in cases of one roadblocks.

6. At my office, the chief reporter and news editor always rendered assistance to me. Besides my office also provided all the incentives to me so that I can report using RTI as a vehicle. Office also gave us opportunity to learn from the experiences of Indian journalist Saikat Datta, who excelled in investigative journalism using RTI Act.

The Last Words

More often we use anonymous sources to make reports on sensitive issues. We know for sure in most of the cases those information are correct no matter sources remain anonymous. We withheld sources'

identities in reports to protect the sources but what if we end up giving at least a few misinformations to our readers in the process.

In contrast, by applying the RTI tools we can unearth many grafts in the society with sufficient proofs and in transparency. There is no issue of keeping the sources' identity secret here. But it may require sometime to change the culture of secrecy. RTI Act is finest of a tool to fight against the practices of non-transparency and corruption. We'll do a great service to the causes of democracy, human rights and good governance if only we can apply RTI efficiently.

তথ্যের আইনি অনুসন্ধান

লড়াইয়ের কাছাকাছি

রাশেদ মেহেদী, সিনিয়র রিপোর্টার, সমকাল

আগের কিছু কথা

তথ্য অধিকার আইন যে সময় পাস হয়, সেই ২০০৯ সালের এপ্রিলে আমি একুশে টেলিভিশনে কর্মরত ছিলাম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকু উপলব্ধি করেছি তা হলো টেলিভিশন সাংবাদিকতায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনন্দিন ঘটনাবলি। বিশেষ করে, সরকারের দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তিদের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও সিদ্ধান্তই টেলিভিশন সংবাদের প্রাণ। এর বাইরে সরকারি নানা সিদ্ধান্ত এবং দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের প্রতিক্রিয়া নিয়েই তৈরি হয় বিশেষ প্রতিবেদন। বিষয়ভিত্তিক কিংবা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, ঘটনার পেছনের ঘটনা নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন হয় কালেভদ্রে। দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ থেকে যখন সংবাদ তৈরির উপাদান কমে যায়, সাধারণত তখনই কিছু বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হয়। এ কারণে টেলিভিশন সংবাদকর্মীদের তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কৌতূহল নেই বললেই চলে। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছিল। গেজেট আকারে প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছিল ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল। সংগত কারণে সংবাদকর্মী হয়েও আমার এই আইনের প্রতি ততটা আগ্রহ জন্মেনি। এ কারণেই আইনটি পাস হওয়ার এক বছর নয় মাস পর্যন্ত এর প্রয়োগ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

২০১০ সালের ১ অক্টোবর *সমকাল*-এ যোগ দেওয়ার মাধ্যমে আমি আবারও ফিরে আসি সংবাদপত্রে। একুশে টেলিভিশনের আগে ১৯৯৮ সালের ২১ অক্টোবর থেকে থেকে ২০০৭ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত *সংবাদ, ভোরের কাগজ* ও *দৈনিক জনকণ্ঠ* পত্রিকায় দীর্ঘ প্রায় নয় বছর কাজ করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে সংবাদপত্রে কাজ করার সময় তথ্য পাওয়ার জন্য একটা আইনি অধিকার থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি বারবার। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসের একটা ঘটনায় সেই অনুভব অনেক বেশি তাড়া করেছিল। সে সময় আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার হলুদ সাংবাদিকতা এবং বিজ্ঞাপন-বাণিজ্য নিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় আমার একটা ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রতিবেদন তৈরি করার আগে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তৎকালীন ডিএফপির মহাপরিচালক খোরশেদ আলমের কাছে বিভিন্ন পত্রিকায় আগের এক বছরের বিজ্ঞাপন বরাদ্দের তথ্য চেয়েছিলাম। তিনি জানিয়েছিলেন, অফিস সিক্রেসি অ্যাক্ট বলে একটা আইন আছে। এই আইনের বাধ্যবাধকতার জন্য তার পক্ষে কোনো তথ্য দেয়া সম্ভব নয়। তার হাত-পা বাঁধা। অবশ্য তার হাত-পা বাঁধা থাকলেও তথ্যের হাত-পা বেঁধে রাখা যায়নি। ওই অফিসেরই আরেকজন কর্মকর্তার কাছ থেকে সোর্সের নাম-পরিচয় গোপন রাখার শর্তে (সাংবাদিকতার প্রচলিত রীতি) পুরো তথ্যই পেয়েছিলাম। সেখানে দেখা যায়, ডিএফপির তালিকায় দৈনিক *প্রথম আলোর* চেয়ে *দৈনিক আজকের প্রত্যাশা* নামের একটি পত্রিকার সার্কুলেশন বেশি। অবশ্য বাজারে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও *দৈনিক আজকের প্রত্যাশার* কোনো কপি তখন পাইনি। শেষে ডিএফপির একজনের কাছ থেকেই ওই পত্রিকার একটা কপি সংগ্রহ করেছিলাম। প্রতিবেদনটি তৈরির শেষ পর্যায়ে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম বললেন, 'ডিএফপিতে একটা চক্র দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞাপন-ব্যবসা করছে। আমরা এটা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করছি। আদালতের একটা রায়ও আমাদের সহযোগিতা করছে। তবে এই চক্র অনেক শক্তিশালী এবং এর সঙ্গে আমাদের দলের লোকজনও জড়িত আছেন। এ জন্যই এটা ভাঙা খুব সহজ নয়।' এই ফাঁকে তাকে ডিএফপির মহাপরিচালকের তথ্য না দেওয়া সম্পর্কে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের (দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন) উদাহরণও বললাম। তিনি খুবই হাসিখুশি এবং আন্তরিক ভাষায় কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, 'সমস্যাটা এখানেই। আমি ল্যান্ড (ভূমি মন্ত্রণালয়) থেকে ইনফরমেশনে (তথ্য মন্ত্রণালয়) এলাম প্রায় এক বছর হয়ে গেল। ২০০৪-এর এপ্রিলে ল্যান্ড বদল করে আমাকে ইনফরমেশন দেয়া হলো। ল্যান্ডে থাকতেই আমার মনে হয়েছে, সেখানে ভূমি নিয়ে শুধু সময়মতো সঠিক তথ্য না পাওয়ার কারণে জনগণ ভোগান্তি পোহাচ্ছে, আমরা দেখছি।' তিনি আরও বললেন, 'অফিশিয়াল সিক্রেটস রক্ষার আইন আছে, কিন্তু জনগণের সরকারি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানানোর পক্ষে কোনো আইন নেই। আপনারা সাংবাদিকেরাও নিজেদের সোর্সের মাধ্যমে সব তথ্য বের করেন। আইনের প্রয়োজন মনে করেন না। আমার মনে হয়, একটা আইন থাকলে ভালো হতো। এখন অনেক অফিস নিয়ে ভুল নিউজ হয়, এর কারণ কিন্তু অথেনটিক সোর্স না থাকা। আপনার গোপন সোর্স কিন্তু তার স্বার্থের জন্য তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খবর দেন। ডিএফপির মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে যিনি তথ্য দিয়েছেন, তার কিন্তু নিজের একটা স্বার্থ

আছে, কিংবা তার স্বার্থে আঘাত এসেছে বলেই তথ্য দিয়েছেন। এই তথ্য পুরো ঠিক হবে, তার গ্যারান্টি কি আপনার কাছে আছে?' আমি শুধু শুনছিলাম। আসলে আমার কয়েক লাইন বক্তব্য দরকার ছিল, উনি অনেক বেশি বলছেন। তিনি কী যেন একটা ভেবে আবার বললেন, 'যাহোক, অনেক কথা বললাম। বলা উচিত নয়। আপনি একটা ভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন করছেন, এ জন্যই বললাম। তবে খুশি হব আপনার প্রতিবেদনের মধ্যে আমার কোনো বক্তব্য না থাকলে। আদারওয়াইজ নেবেন না, আসলে আমার দলের ভেতরে অনেকে আছেন, যারা আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা চালান, বিজ্ঞাপন-বাণিজ্যও করেন। এটাই একটা লিমিটেশন। আমি তো কথা বললাম, আমার বক্তব্য প্রতিবেদনে না থাকলেও আশা করি আপনার প্রতিবেদন তৈরিতে কোনো সমস্যা হবে না।' মন্ত্রীর এই অনুরোধ শুনে মনটা একটু খারাপ হলো। কেননা মন্ত্রীর বক্তব্য ছাড়া প্রতিবেদন করলে সেটার ওজন (গুরুত্ব) কমে গেল। তবুও মন্ত্রীর অনুরোধ রাখতে হলো। তবে আমার প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর খুব দ্রুত অ্যাকশন হয়েছিল, বেশ পুলকও অনুভব করেছিলাম। ডিএফপির সেই মহাপরিচালক বদলি হলেন, আরও কয়েকজন কর্মকর্তা স্ট্যান্ডরিলিজ হয়ে গেলেন, বিজ্ঞাপন দেওয়ার একক কর্তৃত্বও ডিএফপির আর থাকল না। আজ এত বছর পর সেই স্মৃতি মনে হলো তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে। 'তথ্য জানার জন্য আইন থাকা দরকার,' আবেগের বশেই হোক, আর কথার ফাঁকেই বলুন, কিংবা ভেবে চিন্তেই বলুন, সে সময়ের তথ্যমন্ত্রী কথাটা বলে ফেলেন। আমি তখন তার এই কথার গুরুত্ব বুঝিনি কিংবা বোঝার চেষ্টাও করিনি। এখন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবে হাতে থাকার পর তার প্রয়োগ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। একসময় আলাপের ফাঁকে যা কল্পনার 'আকাশ কুসুম' ছিল, এখন তা দিনের আলোর মতো 'ঝকঝকে বাস্তব'।

প্রত্যাশার বৃহৎ ডানা

টেলিভিশন সাংবাদিকতা ছেড়ে পত্রিকায় ফিরে আসার পরও হাতের কাছে তথ্য অধিকার আইন আছে, এটা সাংবাদিকতায় কাজে লাগতে পারে, তা প্রথমে মাথায় আসেনি। প্রথম মাথায় এল, যখন কিছু দুর্নীতির তথ্য সম্পর্কে এলজিইডির (স্থানীয় সরকার বিভাগ) প্রধান প্রকৌশলীর বক্তব্য নিতে গেলাম। সকালে গেলাম, তার দপ্তরের একজন কর্মকর্তা বললেন, 'বিকেলে আসেন, উনি পাঁচটার পরে দর্শনার্থীর সঙ্গে দেখা করেন। বিকেলে গিয়ে দেখি, অনেক মানুষের ভিড়। দীর্ঘ লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছেন প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। মনে হচ্ছে, বিশ্বকাপের টিকিটের জন্য কিউ। তার কক্ষের উল্টো দিকের কক্ষে একজনকে বললাম একটু ঢোকার ব্যবস্থা করতে। সম্ভবত আমি সাংবাদিক, এটা আগে বুঝতে পারেননি। বুঝতে পেরে বললেন, 'ওহ্ আচ্ছা, আপনি খবর লিখবেন, সেজন্য আসছেন। আমি তো ভাবছি এলাকার কোনো কাজ নিয়ে এসেছেন। তা ভাই, এখন তো আর মুখে মুখে কিছু নেই, লিখিত নিয়ে আসেন, স্যার লিখিত পেলে অবশ্যই বলবেন।' আমি প্রথমে বুঝিনি। উনিই সহজ করে দিলেন। বললেন, 'এখন তো আইন আছে, কী তথ্য চান লিখে দেবেন, দিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে ঘোরাঘুরির দরকার কী?' আমি তখনো তথ্য অধিকার

আইন পড়ে দেখিনি। কীভাবে তথ্য চাইতে হয় জানি না। আবার দেরি করার সময় নেই। অফিসে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় দুবার বেড়েছে। তৃতীয় দফা অনুরোধ করলে বিব্রত হতে হবে। একে তো টেলিভিশন ছেড়ে কেন আবার পত্রিকায় এলাম, এখানকার সবার কাছে সেটা বিরাট প্রশ্ন? তার ওপর কাজে একটু এদিক-সেদিক হলেই 'ওকে দিয়ে আর পত্রিকায় হবে না' মুখের ওপর কে কখন বলে দেয়! ভেতরে একটা ভয় তো আছেই। অতএব আইন না দেখেই চোখ বন্ধ করে চারটা প্রশ্ন লিখলাম। এলজিইডির ওয়েবসাইট থেকে প্রধান প্রকৌশলীর ই-মেইল অ্যাড্রেস নিয়ে আগে একটা মেইল করলাম। এরপর প্রিন্ট নিয়ে ছুটলাম। বিকেল পাঁচটা থেকে ঝাড়া সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বসে থাকা। অবশেষে দেখা পেলাম প্রধান প্রকৌশলীর। তাকে সবিনয়ে প্রশ্নপত্রটা দিলাম। 'এ পর্যন্ত কতজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করেছেন এবং তদন্তের ফল কী?' এই প্রশ্নে তিনি কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করলেন, 'এটা ভাই কেমন প্রশ্ন হলো। তদন্ত একটা বিভাগীয় ব্যাপার, এটা প্রতিবেদন (সংবাদ) হবে কেন?' আমি মোটামুটি বিনয়ের অবতার সেজে বললাম, 'আসলে আমি জেনেছি, আপনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত লড়াই করছেন। তার একটা ভালো ফলও পাচ্ছেন। তো অবশ্যই আপনি তদন্ত করেই লড়াই করছেন। আপনার সেই ন্যায়ের পক্ষে লড়াইয়ের তথ্যই চাইছি।' তিনি বেশ ভালো করে আমার দিকে তাকালেন। তার পিএস ফিরোজ সাহেবকে ডাকলেন। তাকে বলে দিলেন, আমি যা জানতে চাই যেন সহযোগিতা করা হয়। এক সপ্তাহ পর আমাকে দুই পৃষ্ঠার তথ্য দিলেন ফিরোজ সাহেব। সঙ্গে একটা বার্ষিক রিপোর্টের কপি চেয়ে নিলাম। এরপর 'এলজিইডি দুর্নীতির সাজানো বাগান' শিরোনামে *সমকাল*-এ একটি প্রধান প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। যদিও উল্লেখ করিনি, কিন্তু *সমকাল*-এর এই প্রতিবেদনটি ছিল আমার জন্য তথ্য অধিকার আইনের অনানুষ্ঠানিক প্রয়োগ। এর 'ভিত্তি তথ্য' আমি পেয়েছি আমার লিখিত প্রশ্ন থেকে। রিপোর্টের বাকি অংশ ছিল তথ্যের বিশ্লেষণ।

সমকাল-এ যোগ দেওয়ার মাস খানেক পর একদিন প্রধান প্রতিবেদক শাহেদ চৌধুরী বললেন, তথ্য অধিকার আইন নিয়ে 'এমআরডিআই' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সম্পাদক গোলাম সারোয়ার মহোদয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। এই প্রকল্পে কাজ করার জন্য *সমকাল* থেকে আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। পরে জানলাম, আমার সঙ্গে রফিকুল ইসলাম সবুজও (বর্তমানে *দৈনিক সকালের খবর*-এ কর্মরত) এই প্রকল্পে কাজ করবেন। আমাদের মেনটর হিসেবে থাকবেন যুগ্ম বার্তা সম্পাদক দীপঙ্কর লাহিড়ী। মাননীয় সম্পাদক গোলাম সারওয়ার আমাদের ডেকে বললেন, 'কাজটা ভালো করে করো। এর মধ্য দিয়ে একটা ভালো প্রতিবেদন চাই। আর সাংবাদিক হিসেবে এই আইন সম্পর্কে ভালো করে জানা উচিত। নিজে জেনে অন্যদেরও জানাবে।' তার কথায় অনুপ্রেরণা পেলাম। এরপর এমআরডিআই-এর সঙ্গে বৈঠক হলো কারওয়ান বাজার এলাকার একটি অভিজাত হোটেলে। বৈঠকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত অন্য দুটি সংবাদমাধ্যমের কর্মীরাও ছিলেন। এমআরডিআই-এর প্রধান হাসিবুর রহমান মুকুর ভাই খুব সংক্ষেপে প্রকল্প সম্পর্কে বললেন। দেখলাম, তথ্য অধিকার আইন নিয়ে

এমআরডিআই-এর প্রকাশনাও বের হয়েছে। এই বৈঠকেই প্রথম পূর্ণ চোখে দেখলাম তথ্য অধিকার আইন। বৈঠক শেষ করে অফিসে এসেই বসে পড়লাম আইন নিয়ে। বেশ কৌতূহল হচ্ছে। বিশেষ করে, ৮, ৯, ২৪ ও ২৭ ধারা বেশ চমকপ্রদ। তথ্য পাওয়ার জন্য ভালো একটা আয়না মনে হলো আইনটাকে। এই আয়নায় চোখ রাখতে হবে তথ্যদাতা এবং তথ্যগ্রহীতা– দুই পক্ষকেই। তথ্যদাতা কোনো কারণে নিজের চেহারা যদি বিকৃত করেন, তার সেই চেহারাও আয়নায় দেখার সুব্যবস্থা রয়েছে ধারা ৯-এর তথ্য প্রদান-পদ্ধতির বিস্তারিত প্রক্রিয়ায়। তবে হতাশ হলাম অনন্য রায়হানের সম্পাদনায় এমআরডিআই-এর প্রকাশনাটি পড়ে। এখানে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মরত সংবাদকর্মীদের মতামত আছে। আছে বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদেরও বক্তব্য। অধিকাংশ বক্তব্য হতাশাজনক। তবে কিছু গঠনমূলক সমালোচনাও আছে। চট্টগ্রাম বিভাগের আলোচনায় চট্টগ্রামের পটিয়ার নিভৃত গ্রামের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা)-এর নির্বাহী পরিচালক শিশির দত্তের একটা মন্তব্যে চোখ আটকে গেল। 'আমার মনে হয়, এই আইন বাস্তবায়নের জন্য যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যুক্ত রয়েছে, তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। তারা জনগণের মধ্যে এই আইন কী করে নিয়ে যাবেন তা জানেন না।' আমরাও জানি না, এই আইন দক্ষতার সঙ্গে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়। শিশির দত্তের সঙ্গে পটিয়ার সেই গ্রামে বিটা অফিসে বসে আমার আলাপের সুযোগ হয়েছিল ২০০৩ সালের আগস্ট মাসের দিকে। তখন আমি *ভোরের কাগজ*-এ কাজ করি। সে সময় স্থানীয় সরকারের সর্বোত্তম প্রকল্পের কাজ দেখার জন্য একটি প্রকল্পের আওতায় আমরা কয়েকজন সাংবাদিক ২২টি জেলায় একটানা ভ্রমণ শুরু করেছিলাম, যার শুরু পটিয়ার বিটা কার্যালয় থেকে। ঢাকা থেকে সরাসরি পটিয়া। আমার মতো অতি ক্ষুদ্র একজন সংবাদকর্মীর নাম এখন আর শিশির দত্তের মনে আছে কি না জানি না। সন্ধ্যায় আলাপের এক ফাঁকে তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, থিয়েটার আর্টস একটা ইনস্টিটিউট, এখানে কেন? এখান থেকে কত দূর যেতে চান? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'সব প্রতিষ্ঠান শহরে হবে, এটা ভাবছেন কেন? গ্রামে ভালো প্রতিষ্ঠান থাকলে, সেখান থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ কিছু জানতে পারলে শহর-গ্রামের বৈষম্য কমে যাবে। আমি গ্রাম থেকে গ্রামেই যেতে চাই, শহরে নয়। আমি কিন্তু গ্রামের মানুষকে শেখানোর দায়িত্ব নিইনি। জানানোর চেষ্টা করছি নিজেদের দায়িত্ববোধ থেকে।' শিশির দত্তের মন্তব্যে চোখ আটকাল। আলাদা করে ডায়েরিতে টুকে রাখলাম। এই আইন প্রয়োগের আগে নিজের দক্ষতা দরকার। এজন্য ভালো করে জানতে হবে। নিজে না জানলে এই আইন থেকে বড় সুফল পাওয়া যাবে না। পুরো আইন আবার ভালো করে পড়লাম। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক রালফ ফ্রেমেলিনো এলেন সমকাল অফিসে। আলাপ হলো কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করব। কোথায় তথ্য চাইব। আমাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ঠিক হলো ঢাকা সিটি করপোরেশন। এই প্রতিষ্ঠান আমার অনেক দিনের চেনা। সেই ২০০২ সাল থেকে অসংখ্যবার গেছি সংবাদ সংগ্রহের জন্য। এই কর্মকর্তা সেই কর্মকর্তা ধরে, খাতির জমিয়ে, অনুনয়-বিনয় করে একেকটা তথ্য বের করা, সেটা আবার জাস্টিফাই করার জন্য সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য

নিতে আরেক গলদঘর্ম অবস্থা। এই প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি আর ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার অনেক চিত্র আমার চোখের সামনে রয়েছে। বিশেষ করে, এই প্রতিষ্ঠানে ভান্ডার বিভাগ বলে একটা বিভাগ আছে, যারা সব সময় অফিস সিক্রেসির দোহাই দেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, সিটি করপোরেশনের এই বিভাগই হবে আমার প্রধান লক্ষ্য। এবার আইন আছে হাতে, পেছনে আছে একটি প্রকল্পের ছায়ার নিচে একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের সহায়তার হাত। টেলিভিশন সাংবাদিকতার 'আলেয়া' ছেড়ে আবার সংবাদপত্রের আলোর নিচে এসেছি। একটা বড় কিছু করে দেখানো দরকার। আমার কাছে মনে হলো এটা একট বড় সুযোগ। বিশেষ করে, আইন প্রয়োগ করে ১০০ ভাগ অথেনটিক তথ্য নিয়ে একটা বড় রিপোর্ট, প্রথম প্রেমের কল্পনার মতো অনেকটা শিহরিত হওয়ার মতো অবস্থা। সহকর্মী রফিকুল ইসলাম সবুজ বললেন, '২০ দিন সময় নিয়ে তথ্য পাওয়ার এই আইন দিয়ে কতটা কী হবে, তা বোঝাই মুশকিল।' তার যুক্তি হেলাফেলা করার মতো নয়।

তবু শুরু হলো আইনি অভিযান

দুজনের ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, বয়সের ব্যবধান প্রায় দেড় যুগের, আবার উচ্চতায় বিশাল তফাত। বসে থাকলেও তার সঙ্গে কথা বলতে হয় ঘাড় উঁচু করে। তবু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমার ভালো বন্ধু হয়ে গেলেন রালফ ফ্রেমেলিনো। যুক্তরাষ্ট্রের *লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস*-এ ২৫ বছর কাজ করার পর বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক। পদবিটা পরামর্শক হলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সংবাদমাধ্যমের উন্নয়ন বিষয়ে সরজমিনে কাজ করাই তার দায়িত্ব। অবশ্য সাংবাদিকতার বড় একটা অংশ তার চলে গেছে আফ্রোদিতির প্রেমে। দুনিয়ার দশদিগন্ত ঘুরে কোথায় কে কবে আফ্রোদিতির মুখ কিংবা শরীর কল্পনা করে ছবি এঁকেছেন, ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন, তার সন্ধান করেছেন রালফ। বাংলাদেশে বসে, ভিন্ন জগতের মানুষের সান্নিধ্যে থেকেও সেই আফ্রোদিতির সাধনা শেষ হয়নি। একটু সুযোগ পেলেই বলতেন, 'মাই বুক ইজ কামিং, *চেইজিং আফ্রোদাইটি*।' রালফের কথা আগেই বলেছি, এত ভূমিকার কিছু ছিল না। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপারে পাঠ দিতে এসেছেন যে মানুষটি, তার কীর্তি সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা থাকা ভালো। সম্প্রতি রালফ এবং জেসন ফ্লেচের লেখা *চেজিং আফ্রোদিতি* পশ্চিমে বেশ আলোচিত এবং এই বইটিকে আফ্রোদিতিকে নিয়ে বিশ্ব-উন্মাদনা শুধু নয়, বাণিজ্যের নতুন অনুষঙ্গের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলেও মনে করে *লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস*। বইটির শেষ বাক্যের আগের বাক্যটিই বড় একটি চমক, এখান থেকেই বোঝা যায়, নিজের কৌতূহল আর গবেষণার সঙ্গে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার যোগসূত্রটি। 'True, at once the greatest sinner and the greatest champion of reform, has been made to pay for the crimes of all American museums.'

রালফের সঙ্গে যেদিন প্রথম কথা হয়, সেদিনই অনেকটা সহজ হয়ে গেছি। তিনি আরও সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন আমাদের তথ্য অধিকার আইনে কী আছে এবং

প্রকল্পের মূল চাওয়াটা কী। ঢাকা সিটি করপোরেশনে মশার ওষুধ কেনার জন্য ব্যয় থেকে শুরু করে এর জন্য জনবল এবং বরাদ্দের বিবরণ চাওয়া হবে, সঙ্গে কেনাকাটার রসিদ এবং এ-সম্পর্কিত বৈঠকের তথ্য। চাওয়া হলো সিটি করপোরেশনের মার্কেট ও ফুটপাত নির্মাণ সম্পর্কে তথ্য। এর পাশাপাশি অডিট অ্যান্ড কম্পট্রোলার জেনারেলের কার্যালয়ে সিটি করপোরেশনের অডিট চেয়ে আবেদন করা হলো। রালফের আগ্রহে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের বরাদ্দ কীভাবে হচ্ছে তা জানতে চেয়ে পরিবেশ ও বন এবং খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ে পৃথক একটি আবেদন করারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। 'সময় গেলে সাধন হবে না'– বাংলার বাউলসাধক লালনের এই দর্শন মার্কিন মুলুকের প্রৌঢ় রালফ খুব ভালো করে বোঝেন, সেটা তার কাজের ধরন থেকেই বোঝা যায়। বিকেলে চূড়ান্ত হলো কোন কোন অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করা হবে। সন্ধ্যায় সমকাল অফিসের নির্জন বোর্ড রুমে প্রায় তিন ঘণ্টা বসে থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করলেন রালফ। কয়েকবার উঁকি দিয়েছি। হায় রে ঢাকার মশা! ল্যাপটপের ছোট্ট পর্দায় চোখ রাখার পাশাপাশি মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য অনবরত হাত ছুড়তে হয়েছে রালফকে। রাতে রালফ যখন বিদায় নিলেন তখন প্রশ্নপত্র তৈরি। আমাদের প্রত্যেকের ই-মেইলেও চলে এসেছে।

পরদিন মহা উৎসাহে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করার জন্য বের হব। সব প্রস্তুতি শেষ। রাত পৌনে ১২টার দিকে ফোন এল, সারা দেশের বিশুদ্ধ পানির সংকট, পানির স্তর নেমে যাওয়া বিস্তারিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে হবে এবং তা জমা দিতে হবে পরের দিন বিকেল পাঁচটার মধ্যে। এজন্য আমার সঙ্গে আরও দুজন থাকবেন। তবে মূল দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হবে। প্রধান প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন, 'কোনো উপায় নেই, দিতেই হবে।' রফিকুল ইসলাম সবুজ ভাইয়ের কথা খুব মনে হলো। আমাদের দরকার কয়েক মিনিটের ভেতর বিস্তারিত তথ্য। ২০ দিনের লম্বা সময় দিয়ে তথ্য কি আর সাংবাদিকদের চলে? যা-ই হোক, সারা দিন ছুটে আমি, নুরু রহমান (বর্তমানে একুশে টেলিভিশনের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক) এবং বদরুদ্দোজা সুমন মিলে অনুসন্ধানী না হলেও বিশেষ একটা প্রতিবেদন জমা দিলাম। তথ্য অধিকারের আবেদন নিয়ে পরের দিন যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম।

প্রথম আবেদন জমা দিলাম ঢাকা সিটি করপোরেশনে (২২ নভেম্বর ২০১০)। একই দিনে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়েও জবাব দিলাম। ৫ ডিসেম্বর আবেদন জমা দিলাম পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং কম্পট্রোলার অব অডিটর জেনারেলের অফিসে। আবেদন জমা দেওয়ার এক সপ্তাহ পর আবেদনের ব্যাপারে খোঁজখবর নেব। এজন্য আবার আইনটা ভালো করে পড়তে বসলাম। পড়তে গিয়েই ভুলটা ধরা পড়ল। আবেদন করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা বরাবর, অথচ ডিসিসিতে আবেদন করেছি মেয়র বরাবর, দুই মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী বরাবর। শুধু কম্পট্রোলার অব অডিটর জেনারেলের অফিসেই আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছি। কারণ রালফ এই তথ্য কর্মকর্তার নাম জানতেন এবং আবেদনপত্রে সেটা নিজেই উল্লেখ করেছিলেন। এই ভুল নিয়ে মেনটর দীপঙ্কর লাহিড়ীর সঙ্গে আলাপ

করলাম। তিনি স্মিত হেসে বললেন, এখন বিষয়টা নিয়ে চুপ থাকেন। আগে তথ্য নিয়ে নেন। ডিসিসিতে আবেদন করেছিলাম বাংলায়। সেখানে কেনাকাটার রসিদ এবং এ-সংক্রান্ত বৈঠকের সিদ্ধান্তের ফটোকপি চাওয়ার কথা বলতে ভুলে গেছি। অবশ্য ডিসিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা আবদুর রহমান নিজেই জানালেন, তিনি তথ্য অধিকার আইন ভালো করে পড়েননি। তিনি নির্ধারিত ২০ দিনের দুই দিন আগেই তথ্য দিয়ে দিলেন লিখিতভাবে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হলো– জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত তহবিলের পুরো দায়িত্বে আছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ে তখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা কেউ নেই। একজনকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। অতএব আরেকটি নতুন আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হলো। শুধু কম্পট্রোলার অব অডিটর জেনারেলের অফিসের কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম নিজে ফোন করে জানালেন, আবেদন অনুযায়ী ২০০৭-০৮ বর্ষের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বিষয়ে অডিট রিপোর্ট আমার ই-মেইলে পাঠানো হয়েছে। এখানে ডিসিসির ব্যাপারে একটি অধ্যায় আছে। এর বাইরে কোনো তথ্য নেই। সমস্যা হলো ডিসিসি থেকে আমরা তথ্য পেয়েছি ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ বর্ষের সর্বশেষ কার্যক্রম সম্পর্কে। অডিট রিপোর্ট পাওয়া গেল ২০০৭-০৮ বর্ষের। ফলে এই অডিট রিপোর্ট থেকে খুব বেশি লাভ হলো না।

পুরো বিষয়টি জানার পর রালফ বেশ মর্মাহত হলেন। রালফ আবার এলেন সমকাল অফিসে। ডিসিসির দেওয়া তথ্য নিয়ে আলাপ হলো। এবার রালফ বললেন, 'এখন আমাদের কাজ হবে শুধু ডিসিসি নিয়েই এবং এটা ভালোভাবে করতে হবে।' রালফ তার পরিচিত একজন কীটনাশক বিশেষজ্ঞ নিয়ে ডিসিসির মশার ওষুধ কেনার ব্যাপারে দেওয়া তথ্য নিয়ে আরও এক দিন সবকিছু বিশ্লেষণ করার কথা বললেন। এতসবের মধ্যে হঠাৎই প্রধান প্রতিবেদক জানালেন, পৌরসভা নির্বাচন কাভার করতে ঢাকার বাইরে যেতে হবে। সেই মুহূর্তে পৌরসভা নির্বাচন দেশের সবচেয়ে বড় ইস্যু। অতএব অনিবার্যভাবেই ছুটতে হলো। বরিশাল ও নোয়াখালী অঞ্চলের পৌর নির্বাচন কাভার করার পর ঢাকায় ফিরে এলাম ২১ জানুয়ারি। এরপর রালফের সঙ্গে পরবর্তী বৈঠকের তারিখ ঠিক হলো ১ ফেব্রুয়ারি। সেদিনও বৈঠক হলো না। কারণ আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর স্থাপন নিয়ে দেশে অস্থিরতা চলছে। ছুটতে হলো সেখানে। শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ আরেক দফা বৈঠক হলো রালফের সঙ্গে।

রালফ তার পরিচিত বিশেষজ্ঞ এবং আমাকে নিয়ে বসলেন। পুরো তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, দুই বছরের মোট বরাদ্দের মধ্যে ১০ কোটি টাকা খরচ করেনি ডিসিসি। এই ১০ কোটি টাকা কোথায় ব্যয় হয়েছে, এই প্রশ্নসহ নতুন করে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিলাম ডিসিসিতে। এবার আইন কঠোরভাবে অনুসরণ করা হলো। ২০ ফেব্রুয়ারি আবেদন করা হলো। কেনাকাটার রসিদসহ বিভিন্ন বৈঠকের সিদ্ধান্তের কপি, ডিসিসির স্বাস্থ্য বিভাগ এবং ভান্ডার বিভাগের মধ্যে এ-সংক্রান্ত 'করসপন্ডিং ফাইল' দেখার অনুমতিও চাওয়া হলো। এবার ডিসিসি আর তথ্য দেয় না। ২০ দিন পার হওয়ার পর ডিসিসির জনসংযোগ বিভাগের তথ্য কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায় জানালেন,

ভান্ডার বিভাগ থেকে তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েও লাভ হয়নি। চিঠি দেখতে চাইলে তিনি বললেন, তিনি নিজে তথ্য কমিশনে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন, নোটশিট দেখানোর কোনো নিয়ম নেই। আমি বললাম, 'আমি নোটশিট চাইনি, আপনারা ভান্ডার বিভাগে যে চিঠি দিয়েছেন, সেটা দেখান।' অনেক চেষ্টা করেও নোটশিট ও চিঠির পার্থক্য তাকে বোঝানো গেল না। শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অন্য একজনকে অনুরোধ করে ব্যক্তিগত ভালো সম্পর্কের দিব্যি দিয়ে চিঠিটা দেখলাম। দেখলাম চিঠিটি লেখা হয়েছে ডিসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আওতায় ডিসিসির মশক নিধনসংক্রান্ত কিছু তথ্য চেয়ে দৈনিক *সমকাল*-এর সিনিয়র রিপোর্টার রাশেদ মেহেদী গত ২০.১২.২০১১ তারিখে আবেদন করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের সহযোগিতা চেয়ে নথিখানা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হোক। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তরের চাওয়া তথ্যাদিও নথিপত্র ভান্ডার ও ক্রয় দপ্তরে রক্ষিত থাকায় এ-বিষয়ক তথ্যাদি প্রদান সম্ভব নয় জানিয়ে ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহের কথা জানিয়ে ফেরত পাঠান। এ প্রেক্ষিতে ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ থেকে তথ্যাদি সরবরাহের সহযোগিতা চেয়ে আপনার মাধ্যমে নথি উপস্থাপিত হলে আপনি সংশ্লিষ্ট বিভাগে গত ২২.০২.১১ তারিখে নথি পাঠান। সর্বশেষ নথিখানা ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগে ২৪.০২.১১ তারিখে পাঠানো হলেও অদ্যাবধি (২৩.০৩.১১) চাহিত তথ্যের ব্যাপারে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে ২০ কার্যদিবস অতিবাহিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ৯ ধারামতে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্যাদি সরবরাহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে একাধিক বিভাগের সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান করা যাবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে আইনের ২৭ ধারামতে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ২০ কার্যদিবসের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য ৫০ টাকা, সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। একে অসাদচরণ হিসেবে গণ্য করতঃ দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য আপনার বরাবরেও এ বিষয় নির্দেশনামূলক একটি অফিস আদেশ জারির জন্য নথি উপস্থাপন করছি।' তার এ চিঠিতে কাজ হয়নি। ভান্ডার বিভাগ কোনো তথ্য দেয়নি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অফিস আদেশও জারি করেননি। এর মধ্যে একদিন ডিসিসির প্রধান তথ্য কর্মকর্তা আবদুর রহমান সাহেবকে দেখলাম বেশ বিচলিত। নগর ভবনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা তথ্য দিতে চান না বলে তিনি বেশ ক্ষুব্ধ। ফাঁকে তার সহকারী কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায় তথ্য কমিশনের জ্ঞানবুদ্ধি নিয়েও সমালোচনা করছিলেন। পরে ঘটনাটা শুনলাম রহমান সাহেবের কাছেই। একজন এনজিও কর্মকর্তা ডিসিসির জন্মনিবন্ধন-সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু তথ্য চেয়েছিলেন। তিনি আবেদন করেছেন ডাকযোগে। সেই আবেদন এসে পড়েছিল ডিসিসির সচিবের দপ্তরে। কারণ সব চিঠি সেখানেই দেওয়া হয়। পরে সেগুলো বিতরণ করা হয়। প্রায় এক মাস চলে গেছে, কেউ চিঠি দিয়ে যায়নি। এর মধ্যে এনজিও কর্মকর্তা ফোন করেছেন, তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তার চিঠি পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে তথ্য কমিশন আকস্মিক তলব করেন রহমান সাহেবকে। বিষয়, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানে ব্যর্থ

হওয়া প্রসঙ্গে শুনানিতে উপস্থিতি। এবার এনজিও কর্মকর্তার চিঠির খোঁজ পড়ল এবং খুঁজে পাওয়াও গেল ডিসিসি সচিবের বাতিল ফাইলে। এই ফাইল তিন মাস পর পর খালি করে ফেলা হয়। খুব সাধারণ কিছু তথ্য চেয়েছেন তিনি। এখন এই সাধারণ প্রশ্ন অসাধারণ হয়ে গেছে। আবদুর রহমান এবং উত্তম কুমার রায় শুনানির দিন তথ্য কমিশনে গেলেন। রহমান সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী, 'আমাকে রীতিমতো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। আমি তাদের বললাম, চিঠিটা হাতে হাতে দিয়ে রিসিভ করিয়ে নিলে এই সমস্যা হতো না।' এ সময় কমিশন ওই কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলেন, চিঠিটি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠানো হয়েছিল কি না। তার জবাব হ্যাঁ-সূচক, চিঠি রেজিস্ট্রি করার রসিদটিও দেখালেন। রেজিস্টার্ড চিঠি বিতরণের যে পৃথক প্রাপ্তি রসিদ থাকে, সেটা তার কাছে ছিল না। যাহোক, কমিশন তথ্য দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহ সময় নির্দিষ্ট করে শুনানি শেষ করল। রহমান সাহেব বললেন, 'আমাদের দায়িত্ব তথ্য দেওয়া, এই বিভাগটির প্রধান কাজই হচ্ছে তথ্য দেওয়া। তথ্যভান্ডার আমাদের কাছে নেই। এখানে আট-দশটি বিভাগ আছে। অধিকাংশ বিভাগের কর্মকর্তারাই তথ্য চাইলে দিতে চান না। সাংবাদিক চেয়েছে শুনলে যাহোক একটা কিছু দেয়। আর যারা তথ্য চায়, তারা এসে আবেদনটা জমা দিলে ক্ষতি কী? একটা রিসিভ কপি তো তাদেরও দরকার। এনজিওর ওই ভদ্রলোক তথ্য চেয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছেন। এই জন্য নিজে না এসে ডাকযোগে চিঠি পাঠিয়েছেন। লোকজন পায়ে হেঁটে এসে তথ্য পাচ্ছে না, আর উনি বাংলার বড় লাট, ঘরে বসে তথ্য চান।' তীব্র ক্ষোভ রহমান সাহেবের কণ্ঠে, থামছেই না, 'তথ্য কমিশনে বলেছি, আবেদনের রিসিভ কপি ছাড়া তারা যেন দয়া করে কোনো আপিল না নেয়। আর আমাদের বিভিন্ন বিভাগের যারা বড় বড় কর্তা সাহেব আছেন, তাদেরও ডেকে নিয়ে এই আইন সম্পর্কে এবং আইন না মানলে কী শাস্তি হবে সে সম্পর্কে একটা ভালো জ্ঞান দিয়ে দেয়। এই যে আপনি তথ্য চাইছেন, বড়কর্তারা তথ্য দেবেন না, তারা ঘোরাচ্ছেন। আমার কী করার আছে, বলেন?' তিনি অনেক কথা বললেন, কিন্তু ৩৫ কার্যদিবসেও তথ্য দিতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত ৬ এপ্রিল গত ২৪ ধারা অনুযায়ী ডিসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর আপিল করতে বাধ্য হই। এক সপ্তাহ পর ডিসিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ফোন করে জানান, আমার আবেদন অনুযায়ী তথ্য পাওয়া গেছে। আমি যেন গিয়ে নিয়ে আসি। পরদিনই গেলাম। এবার নতুন আরেক বেড়াজাল। তথ্যের জন্য খরচ বাবদ দুই টাকা ট্রেজারি চালান করে সেই চালানের রসিদ দিয়ে তথ্য নিয়ে যেতে হবে। আমি বললাম, 'আপনারা কি তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে কোনো তথ্য প্রকাশ নীতিমালা করেছেন?' তিনি হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললাম, আইনে তো আছে। তিনি বললেন, 'ভাই, আমি তথ্য দিতে চাই। ফ্রি দিতে চাই। কিন্তু প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরের নির্দেশ, ট্রেজারি চালান নিতে হবে। আমার কিছু করার নেই। আপনি দয়া করে ট্রেজারি চালান নিয়ে আসেন, ঝামেলা শেষ হয়ে যায়।' গেলাম নগর ভবনের নিচে সোনালী ব্যাংকে। দুই টাকার ট্রেজারি চালানের

কথা শুনে তারা হাসলেন। এই শাখায় আমার কোনো অ্যাকাউন্ট আছে কি না জানতে চাইলেন। এত কিছুর পর আর ডিসিসির ট্রেজারি চালানের একটা নম্বর লাগবে সেটাও বলে দিলেন। ভেবেছিলাম আবার তথ্য কর্মকর্তার কক্ষে যাব। এরই মাঝে অফিসের ফোন বেজে উঠল। দ্রুত যেতে হবে অফিসে। নারীনীতি বিষয়ে সুশীল সমাজের মতামত নিয়ে একটা প্রতিবেদন করতে হবে। মাঝখানে আরও কয়েকটি প্রতিবেদন নিয়ে বেশ ব্যস্ত থাকতে হলো তিন-চার দিন। এক সপ্তাহ চলে গেল। এর মধ্যে এমআরডিআই-এর মুকুর ভাইকে এই অদ্ভুত ট্রেজারি চালানের বিষয়টি জানালাম। তিনি হেসে বললেন, 'ওনারা দুষ্টামি করছেন, আপনিও করেন। আপনি ট্রেজারি চালান জমা দিয়ে দুই টাকার একটা রসিদ নেন। বিষয়টি একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা হবে।' আমি নগর ভবনে গেলাম। নিচতলার সোনালী ব্যাংকের শাখা থেকে আবার নিলাম ট্রেজারি চালানের কপি। তারপর এই কপি নিয়ে ডিসিসির প্রধান তথ্য কর্মকর্তাকে দিলাম চালানের ওপর তাদের কোড নম্বর বসানোর জন্য। একই সঙ্গে জানালাম, আমি মশার ওষুধ কেনার রসিদ এবং কাগজপত্র দেখতে চাই। তারও ব্যবস্থা করুন। আমি 'ডিসিসির তথ্য প্রকাশ' নীতিমালার কপি চাইলাম। উনি বললেন, 'কপি কোথায় পাব, নীতিমালা তো হয়নি। আর ভান্ডার বিভাগ তো বলছে, কাগজপত্র দেখানো সম্ভব নয়। আমার কিছু করার আছে, বলেন? তবে একটা ভুল হয়েছে। ট্রেজারি চালানের আসলে দরকার নেই। এটাও বিভাগের বড় কর্তাদের একটা চালবাজি, আপনাকে কয়টা দিন ঘোরাল আর কি!' বলেই তিনি বিনা মূল্যে তথ্যের কপি দিয়ে দিলেন। খুব সাধারণ তথ্য। কিন্তু এর মাঝেই চোখ আটকে গেল একটা হিসেবে। ৩৪৫ টাকা লিটার দরে উড়ন্ত মশা মারার ওষুধ কিনেছেন তারা। পরে বাজারে কীটনাশক আর ডিজেলের (ওষধুটি এই দু'য়ের সংমিশ্রণ) দাম হিসাব করে দেখা গেল এই ওষুধ ১৩৭ টাকা লিটার দরে কেনা সম্ভব। আর ওষুধ কেনা হচ্ছে মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে। হয়তো তারা নিজের অজান্তেই দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে অতিরিক্ত দামে ওষুধ কেনার তথ্য দিয়ে ফেলেছেন। ভেবেছিলাম, তথ্য কমিশনে পুরো বিষয়টি জানিয়ে আপিল করব। কিন্তু এর মধ্যে অফিস থেকে প্রায় আট-দশটি স্পেশাল প্রতিবেদনের পরিকল্পনা একসঙ্গে ধরিয়ে দেওয়া হলো। অতএব শেষ আপিল করার সময় আর মিলল না।

প্রাসঙ্গিক ও পরবর্তী ভাবনা

প্রকল্পের শুরুতে বলা হয়েছিল, এই প্রকল্পের কাজের জন্য যখনই সময় দরকার হবে, দেওয়া হবে। বাস্তবে সে সময় পাওয়া যায়নি। এমআরডিআই-এর সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকের জন্য সময় পাওয়া গেছে দিনের অ্যাসাইনমেন্ট তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। আবেদনপত্র জমা দেওয়া থেকে শুরু করে এর জন্য যাবতীয় সময় বের করতে হয়েছে অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে। অফিসের ব্যবস্থাপনা সহকর্মীদের মধ্যে প্রধান প্রতিবেদক যেটা বলতেন, 'প্রকল্পের কাজ অবশ্যই করবেন। গুরুত্ব দিয়ে করবেন। তথ্য অধিকার আইনটা ভালো করে বুঝতে হবে, যেন পরে অন্যদের বোঝাতে পারেন। তবে অফিসের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা বিশেষ প্রতিবেদনের জন্য সময়ের ক্ষেত্রে ছাড়

দেওয়া হবে না। দুটোই একসঙ্গে করতে হবে, কীভাবে করবেন সেটা আপনি বুঝবেন।' তথ্য অধিকার আইন দিয়ে সাংবাদিকতায় আসলে কোনো লাভ হবে কি না সেটা তিনি বিশ্বাস করেন না, এটাও আমাকে জানিয়েছেন। প্রায় ২০ বছরের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার আলোকে তার মতামত এমন, 'একটা আইন হওয়া দরকার ছিল হয়েছে, কিন্তু এটা দিয়ে সাংবাদিকতা অসম্ভব। আবেদন করে এভাবে তথ্য নিয়ে কি আর দৈনিক পত্রিকা চলে! নিজস্ব সোর্স ছাড়া সম্ভব নয়।' বার্তা সম্পাদক (বর্তমানে সহযোগী সম্পাদক) সবুজ ইউনূস আইনটি নিয়ে আলাপ করতে চাইলে স্বভাবসুলভ স্মিত হাসি দিতেন। সে হাসিতে কতটা কৌতুক আর কতটা সরলতা ছিল তা বোঝা দুরূহ। যুগ্ম বার্তা সম্পাদক দীপঙ্কর লাহিড়ী ছিলেন মেনটর। তিনি সব সময় খোঁজ নিয়েছেন। পরামর্শ দিয়েছেন। তার আন্তরিকতারও একবিন্দু ঘাটতি ছিল না। কিন্তু যখনই প্রকল্পের কাজের জন্য দু-একটি দিন অ্যাসাইনমেন্ট ফ্রি করতে বলেছি, তখনই তিনি অপারগতা প্রকাশ করেছেন। অফিসের কাজের টেনশন থেকে এক দিনের জন্য হলেও ফ্রি থেকে প্রকল্পের কাজ করার সুযোগ তিনি আমাকে করে দিতে পারেননি। হয়তো এটা তার এখতিয়ারবহির্ভূত ছিল। তবে আমার একটা ভুলের জন্য তিনি কয়েক দফা তিরস্কার করেছেন, ক্ষুব্ধও হয়েছেন। তথ্য চেয়ে করা আবেদন থেকে যেসব তথ্য পেয়েছি তা দিয়ে টুকরো টুকরো করে কয়েকটি প্রতিবেদন করেছি। বিশেষ করে, মশক নিধন সম্পর্কে। দীপঙ্কর দার বক্তব্য, 'আপনি প্রতিবেদন করছেন, সেখানে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের কথা বলছেন না। আবার এভাবে ছোট ছোট করে আগেই প্রতিবেদন দিয়ে পরে বড় কিছু করার সুযোগ হাতছাড়া করছেন।' আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে 'দিন আনি দিন খাই'-এর মতো। হাতে কোনো তথ্য এলে যেমন করে হোক একটা কিছু লিখে দিই। কে জানে, কে আবার কখন আমার আগেই খবরটা দিয়ে দেন! আর একবার কেউ এক শব্দ লিখলেই হয়েছে, খবর বাসি হয়ে যাবে!

এর মাঝখানে এমআরডিআই-তে এসেছিলেন ভারতের আউট লুক-এর বাংলাভাষী সাংবাদিক সৈকত দত্ত। একদিন আমাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন। বিশেষ করে ভারতে চাল রপ্তানি কেলেঙ্কারি নিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হওয়ার মতো এক মন্ত্রীর বড় দুর্নীতি এবং আফ্রিকার দেশ ঘানা থেকে চিঠি দিয়ে ভারত সরকারকে ওই মন্ত্রীকে অপাসরণের অনুরোধের তথ্য বের করার কাহিনি বেশ উপভোগ্য ছিল। সৈকত দত্তের বর্ণনায় ভারতের আমলাতন্ত্রের তথ্য লুকানোর চেষ্টা, কপট গম্ভীর মুখ কিংবা মুচকি হাসির আড়ালে সত্য প্রকাশ না করার নানা ফন্দিফিকির উঠে এসেছে। তার কাহিনি শুনে আমার মনে হয়েছে, আমাদের এখানে আমলাতন্ত্র তথ্য গোপন রাখার ক্ষেত্রে ভারতের আমলাদের মতো অতটা দক্ষ এখনো হয়নি। সৈকত দত্তের বক্তব্য থেকে আরেকটা সত্য বের হয়েছে, তথ্য অধিকার আইন থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও মন্ত্রীর চাল রপ্তানি নিয়ে চালবাজির ভয়াবহ তথ্য চেপে রাখা যায়নি। তথ্য বের হয়ে গেছে। তথ্যের ভেতরে শক্তি আছে। যারা তথ্য চান তারা একটু বুদ্ধিমান হলে তথ্যের শক্তি নিজেই আরও অনেক গূঢ় তথ্যের সন্ধান দেবে, এটা সৈকত দত্তের বর্ণনায় উঠে এসেছে।

প্রকল্প থেকে আমার প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বড় একটা প্রতিবেদন করার যে স্বপ্ন ছিল তা পূরণ হয়নি। কারণ ছোট ছোট অনেক ভুল এবং সেগুলোর সমাধানেই আসলে পুরো সময় চলে গেছে। প্রথম দিকে আইন সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণার কারণে অনেকটা সময় নিষ্ফলভাবে চলে গেছে। আমার মনে হয়েছে, সৈকত দত্তের অভিজ্ঞতাটা আরও আগে শেয়ার করতে পারলে ভালো হতো। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতাগুলো যত বেশি শেয়ার করা হবে, এই আইন আরও দক্ষভাবে প্রয়োগ সম্ভব হবে। তবে এই প্রকল্প আমাকে তথ্য অধিকার আইনের ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা দুটোই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা এই আইনটি এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত নয়। আইনটি ব্যাপক প্রচার এবং এ সম্পর্কে তথ্যদাতা সরকারি কর্মকর্তাদেরও সচেতন করা হয়েছে বলে মনে হয়নি। ডিসিসিতে প্রধান তথ্য কর্মকর্তা আইনটি ভালো করে পড়েছেন, আমার আবেদনের পর। সহকারী তথ্য কর্মকর্তা তথ্য কমিশনে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও খেই হারিয়ে ফেলেছেন, নোটশিট, চিঠি আর সেখানকার সিদ্ধান্তের কপির পার্থক্য বুঝতে তার খুব সমস্যা হচ্ছে। অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তারা এই আইন সম্পর্কে জানেন না। ডিসিসি এই আইনের অধীনে কীভাবে তথ্য দেবে, তারও কোনো নীতিমালা করেনি। মন্ত্রণালয়গুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নাম কাগজে-কলমে থাকলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই কর্মকর্তা অস্তিত্বহীন।

এই আইন ব্যবহার করে কীভাবে সর্বোচ্চ তথ্য পাওয়া সম্ভব এখন মনে হয় সেই উপায়টা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারছি। প্রকল্প চলার সময়ে যে উপায়গুলো মাথায় আসেনি, এখন সেগুলো মাথায় ভিড় করছে। যেমন ডিসিসির কাগজপত্র দেখতে না দেওয়ার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকেই বলতে পারতাম। অনেক ঘোরাঘুরির পর যেহেতু তার কাছে আপিল করার পর আমি কিছু তথ্য পেয়েছি, হয়তো তিনি আমাকে কিছু কাগজপত্র দেখারও সুযোগ করে দিতে পারতেন। পরে তথ্য কমিশনে যাওয়ার কথা ভাবা যেত।

নিজের কাজের ভেতরের ভুল এবং সীমাবদ্ধতাগুলো আগামী দিনের পাথেয় হবে। আগামী দিনে যখন তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করব, তখন নিঃসন্দেহে আরও সচেতন ও দক্ষতার সঙ্গে এটি প্রয়োগ করতে পারব। আমার সমমান ও জুনিয়র সহকর্মীরা অনেকে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এই আইনের মাধ্যমে কতটা কী করা সম্ভব, এর দুর্বলতা কী, আমি কী সমস্যা মোকাবিলা করছি। সিনিয়র সহকর্মীদের এই আইন নিয়ে আগ্রহ কম থাকলেও সমমান ও জুনিয়রদের আগ্রহ অনেক বেশি। একটা বিষয় অবাক করার মতো– আইন পাস হওয়ার প্রায় দুই বছর পরও আমরা বেশিরভাগ সাংবাদিক কেবল প্রাথমিক ধারণা নিচ্ছি। হয়তো লাইনের ওপর ট্রেন দাঁড় করানোর কাজটা এই দুই বছরে হয়েছে। এখন ধীরে ধীরে ট্রেন গতি লাভ করবে, গতি এনে দেবে। এই প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বিশ্বাস করি, একটু চোখ-কান খোলা রাখলে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে পাওয়া সাধারণ তথ্য থেকেও অনেক বড় ধারণা পাওয়া সম্ভব। এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতে

নিজের কাজের ক্ষেত্রে যেমন অনেক বেশি সচেতন থাকতে পারব, সহকর্মী, বন্ধুদের নিজের এই অভিজ্ঞতা থেকে ভালো পরামর্শ দিতে পারব, এই বিশ্বাস আমার জন্ম নিয়েছে।

Never Say Over in RTI Fight

Rased Mehdi, Senior Reporter, Daily Samakal

The government published the Right to Information (RTI) Act into gazette on April 6, 2009. But the necessity of such a law and campaigns for its enactment in Bangladesh have been going on from many previous months. I as a reporter was not so conscious about the application of RTI though I had, in the past, some journalistic exercises in the field of investigative journalism.

Not until late last year, that was nearly one and a half years after the passage of the RTI Act, I was at all aware about the application of RTI. Actually it was at that time my office assigned me along with another reporting colleague of mine and a gatekeeper from the news section to work in a special assignment in cooperation with non-government media development organization MRDI. It was an exercise to have a firsthand experience of applying RTI in gaining information from different institutions where public has a stake. Our joint news editor Diponkor Lahiri acted as our mentor in this assignment.

During the whole course of these RTI activities, I was often distracted from my focused task due to

other emergency assignments that office used to ask me to carry out. But still I tried to do due diligence to the RTI application exercise.

I picked up Dhaka City Corporation and its department dealing with the anti-mosquito drives as my area of interest and discussed with our consultant Ralph Frammolino on how to move forward. He also asked us to file RTI seeking information on how the funds meant for coping with the challenges of climate change were spent.

On November 22, 2010 I submitted an application to the Dhaka City Corporation. The same day I also made an RTI submission to the Food and Disaster Management Ministry. I filed applications to Forest and Environment Ministry and to the office of the Comptroller of Auditor General on December 5, 2010.

Food and Disaster Management Ministry informed me that climate fund info has to be gathered from the Forest and Environment Ministry. CAG office provided me with some audit reports of 2007-08 whereas I got information from the Dhaka City Corporation on the activities carried out in 2009-10 and 2010-11 financial years. So that audit report came not much of use.

Ralph then advised me redirect all my efforts towards gaining information from the Dhaka City Corporation (DCC). Upon discussion with Ralph and one of his acquaintances, who happened to be a insecticide specialist, we found out that DCC didn't actually spend the allocated Tk. 10 crore in the past two years in its fight against mosquito.

On February 20, 2011 I filed RTI application seeking information regarding the DCC budget spending on mosquito menace, copies of the decisions taken on purchases of medicines and equipments to kill mosquito and the relevant receipts.

As 20-day stipulated time was exhausted and DCC didn't give any reply to my application seeking information, I inquired with its information officer Uttam Kumar Roy and he told me that they had sought but not getting the information from the DCC store department. I insisted to know what steps had they taken so far to gain the information from the store department. Upon repeated

insistence I got the copies of their internal correspondence, which showed despite seeking intervention of the DCC chief executive officer (CEO) in making the store department oblige, office of the CEO gave no instructions and store department didn't bother to provide any information.

At last on April 6, 2011 I appealed before the DCC CEO and then a week later DCC's designated information official phoned me to say that I could go and meet them and have my information.

The very following day as I stepped in DCC something strange was waiting for me. I was awestruck to learn that I have to pay a Tk. 2 treasury bill and submit the receipt to get my information. As I inquired that whether the DCC authorities had prepared any policy to provide information in exchange of payments, the DCC information officer gave me a blank look in return. As it took some time more to complete the formalities of paying the treasury bill through a state-owned bank, MRDI's Executive Director Hasibur Rahman told me that they (DCC) actually made a prank with me to buy some more time prior giving me the information.

As I finally completed the process and went to give the receipt of the treasury bill payment, the DCC authorities then told me that it was a mistake and there was actually no need to treasury bill payment. When I asked for the documents related to DCC's purchase of mosquito-killing medicines, the information officer again said the store department didn't agree to divulge the documents. He acknowledged that asking me for a treasury bill payment was a ploy by the DCC's high officials to kill my time. Then he gave me some of the information that I asked for.

In the info document I finally got from the DCC I found out that DCC procured mosquito killing medicines at Tk. 345 a litre whereas it is priced at Tk. 137 a litre only in the market. I thought I would file an appeal with the Information Commission seeking the full information related to the DCC's anti-mosquito activities. But yet again the office gave me some other special assignments to carry out and that distracted my focus from the DCC issue one more time.

Observations

1. Reporters on RTI exercise should be given some relief from other day to day businesses.

2. More experience sharing would be helpful like the one opportunity we got by talking to Saikat Datta, an Indian journalist who applied RTI to make some investigative reports.

3. The government offices should also have their respective policies and structures to cater the information to journalists and public in line with the RTI Act.

4. I am hopeful that through further exercise we'll be able to make better use of RTI applications in the future and come up with good pieces of reports.

আরটিআই প্রয়োগে সাংবাদিকদের আগ্রহ কম

রফিকুল ইসলাম সবুজ, সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক সকালের খবর

একদিন সন্ধ্যায় অফিসে সংসদের একটি নিউজ তৈরির কাজে খুব ব্যস্ত। এমন সময় চিফ রিপোর্টার শাহেদ ভাই (শাহেদ চৌধুরী) ডেকে বললেন, আপনাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন সারওয়ার ভাই (গোলাম সারওয়ার, *সমকাল*-এর সম্পাদক)। এমআরডিআই নামে একটা বেসরকারি সংস্থার কিছু রিপোর্ট নিয়ে কাজ করতে হবে। কয়েক মাস সময় লাগবে। এ জন্য প্রয়োজনে আপনাকে অ্যাসাইনমেন্ট কম দেয়া হবে। সারওয়ার ভাই আপনাকে, রাশেদ মেহেদী ও দীপঙ্কর লাহিড়ী– এই তিনজনকেই এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু কী কাজ করতে হবে তা পরিষ্কার করে না বললেও সাহেদ ভাই এ বেসরকারি সংস্থার ফোন নম্বর দেয়ার ব্যবস্থা করেন। সম্পাদকের দেয়া দায়িত্ব, ভালোভাবে করতে পারব কি না কিছুটা হলেও মনে ভয় লাগছিল। তবে কাজ কী, তা জানতে না পারলেও এমআরডিআই-এর নাম শোনার পরই আমি এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলাম। কারণ এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান মুকুর ভাই আমার অনেক দিনের পরিচিত। তাই কাজের ধরন জানতে না পারলেও আগ্রহটা একটু বেশিই ছিল। আর কিছু না হোক, মুকুর ভাইয়ের সহযোগিতা পাব, এ বিশ্বাসের কথাটা জানালাম রাশেদ মেহেদীকে। মেহেদীও জানাল মুকুর ভাই তারও পরিচিত। সমকাল-এর তিনজনের এই টিমের সবাই আমরা এর আগেও অন্য প্রতিষ্ঠানে সহকর্মী ছিলাম। তাই ভালোই লাগছিল। এবার কাজ কী, তা জানতে ফোন করলাম মুকুর ভাইকে। জানালেন, তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করতে হবে। আমি

আরও আনন্দিত হলাম। কারণ, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে যে আন্দোলন হয়েছে, তারও একজন ক্ষুদ্র কর্মী ছিলাম আমি। আইনটি যে দিন সংসদে পাস হয় সেদিনও সংসদে উপস্থিত থেকে এই সংবাদ লিখেছি। তাই খুব ভালোই লাগছিল। এরপর একদিন *সমকাল* অফিসে এমআরডিআই-এর কনসালট্যান্ট রালফ ফ্রেমোলিনোর সঙ্গে বৈঠক হয় আমাদের তিনজনের। তিনি বুঝিয়ে দেন, কী কী কাজ করতে হবে। আমি যেহেতু সংসদের রিপোর্ট বেশি করি, তাই জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং এর সঙ্গে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিই। ৪ মে ২০১০ সংসদ সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করি। কিন্তু আবেদন করার পর হতাশ হয়ে যাই। বিশেষ করে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানেনই না যে তথ্য অধিকার আইনে তারা তথ্য দিতে বাধ্য। তাদের অফিসে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাও নেই। প্রধান প্রকৌশলীর স্টাফ অফিসারের কাছে আবেদন জমা দেয়ার পর ২০ কার্যদিবস শেষে তথ্যের জন্য গেলে স্টাফ অফিসার জানান, সারা দেশ থেকে তথ্য চেয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে, এলেই দেয়া হবে। সে তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে সংসদ সচিবালয়ে আবেদন জমা দেয়ার কয়েক দিন পর সেখান থেকে ফোন করে জানানো হয়, 'ভাই, আপনার আবেদনটি খুঁজে পাচ্ছি না। প্লিজ, নতুন একটা আবেদন দেয়ার ব্যবস্থা করেন।' আমি ১০ নভেম্বর ২০১০ একই আবেদন আবার জমা দিয়ে আসি। আবেদনে দেশের একজন নাগরিক ও সাংবাদিক হিসেবে আমার পেশার প্রয়োজনে কিছু তথ্য চাই। এগুলো হলো (১)(ক) বর্তমান সংসদে গত ২২ মাসে সংসদ সচিবালয়ের কমন শাখার মাধ্যমে কত টাকার কেনাকাটা হয়েছে, কী কী কেনা হয়েছে এবং কী পদ্ধতিতে করা হয়েছে। টেন্ডারের ধরনসহ কেনাকাটার তালিকা । (খ) কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কেনাকাটা করা হয়েছে। মালিকের নামসহ প্রতিষ্ঠানের তালিকা। (২) বর্তমান সংসদে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা, হুইপসহ ভিআইপিদের আপ্যায়ন বাবদ কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং কোন ভিআইপি কোন মাসে কত টাকা ব্যয় করেছেন তার হিসাব। (৩) সংসদ ভবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে কত টাকা বাজেট এবং গত দুই বছরে এ খাতে কোন বছরে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে। (৪) ঢাকায় বসবাস করলেও সংসদ অধিবেশন ও সংসদীয় কমিটির বৈঠকের সময় এলাকা থেকে বিমানে বা গাড়িতে আসা-যাওয়ার মিথ্যা তথ্য দিয়ে কোনো এমপি ভ্রমণ ভাতা তুলেছেন কি না। তুলে থাকলে তাদের নামের তালিকা এবং বিষয়টি ধরা পড়ার পর কেউ সংসদ সচিবালয়ে টাকা ফেরত দিয়ে থাকলে তাদের নাম এবং কে কত টাকা ফেরত দিয়েছেন সে হিসাব। এই তথ্য চাওয়ার পর প্রায় দুই মাসেও কোনো তথ্য পাইনি এবং সংসদ সচিবালয় থেকে এ ব্যাপারে আমাকে লিখিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। তাই ২০১১ সালের ৫ জানুয়ারি বিষয়টি লিখিতভাবে আমি স্পিকারকে জানাই এবং তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করি। এরপর ১৮ জানুয়ারি ২০১১ সংসদ সচিবালয় থেকে আমাকে আংশিক তথ্য দেয়া হয়। শুধু সংসদের ভিআইপিদের জন্য এক বছরের মোট কত টাকা

আপ্যায়ন খরচ হয়েছে তার হিসাব দেয়। কে কত টাকা খরচ করেছেন তা দেয়া হয় না। এ ছাড়া অন্য যেসব তথ্য চেয়েছিলাম, তা কেন দেয়া হয়নি, তাও জানানো হয়নি আমাকে। বিষয়টি নিয়ে আমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করে কথা বললে তিনি জানান, আপনার আবেদনের ফাইল স্পিকার সাহেবের কাছে পাঠানো হলে তিনি যতটুকু তথ্য দেয়ার অনুমোদন করেছেন, আমরা তা-ই দিয়েছি। বিস্তারিত তথ্য পেতে হলে আপনাকে আবারও লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। তবে আন-অফিশিয়ালি তথ্যগুলো প্রথমে দিতে চাইলেও পরে দিতে অস্বীকৃতি জানান। ঐ কর্মকর্তা বলেন, 'যেহেতু আবেদন করে পাননি, এখন দিলে আমার দোষ হবে।' তাই ঐ কর্মকর্তার পরামর্শে আমি ৩১ জানুয়ারি বিস্তারিত তথ্য চেয়ে আবার আবেদন করি। কিন্তু তার পরও তথ্য না দিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ শাখার পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা এক পত্রে বিস্তারিত তথ্য না দেওয়ার কারণ জানান। চিঠিতে বলা হয়, সংসদের অডিট সম্পন্ন না হওয়ায় এসব তথ্য দেয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু তাদের এই কারণ আমার কাছে যুক্তিসংগত মনে হয়নি। তাই সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন লঙ্ঘন করেছে, এমন অভিযোগ এনে ৩১ মার্চ ২০১১ তারিখে বিষয়টি সংসদ-সচিবের কাছে (আপিল কর্তৃপক্ষ) তথ্য পাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন জানাই। এ অবস্থায় আমি আমার কর্মস্থল দৈনিক *সমকাল* পরিবর্তন করে দৈনিক *সকালের* খবর-এ যোগদান করি। কিন্তু আপিলের কয়েক দিন পরে আমাকে সংসদ সচিবালয় থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয় যে আমার আপিল করাটা যথাযথ হয়নি। গণসংযোগ বিভাগের পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা জয়নাল ভাইয়ের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি জানান, সংসদের আপিল কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন স্পিকার। তাই আমাকে তার কাছেই আপিল করতে হবে। কয়েক দিন পরে ফরম 'গ' অনুযায়ী আবারও আপিল করি স্পিকারের কাছে। আবেদন জানাই আমার চাহিদামতো তথ্য সরবরাহের।

আপিল আবেদন করার আগে মুকুর ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আবেদনের বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি। পরে আবেদন করা হয়। আবেদনে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল এ রকম :

যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে : তথ্য চেয়ে আবেদনের পর সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ শাখা থেকে গত ১৮ জানুয়ারি ২০১১ ও ২৮ মার্চ ২০১১ তারিখে সরবরাহ করা অসম্পূর্ণ তথ্যসংবলিত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে। (ফটোকপি সংযুক্ত)।

যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে : দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা (পরিচালক, গণসংযোগ), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

আপিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : আমি রফিকুল ইসলাম সবুজ, দৈনিক *সমকাল*-এর

সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন গত ৩০ নভেম্বর ২০১০ তারিখে তথ্য চেয়ে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছিলাম। (আবেদনের ফটোকপি সংযুক্ত)। এর প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ১৮ জানুয়ারি-২০১১ তারিখে আমার চাহিদা অনুযায়ী তথ্য না দিয়ে আংশিক তথ্য প্রদান করেছে। এরপর গত ৩১ জানুয়ারি আমি বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পুনরায় আবেদন করার পরও তথ্য দেওয়া হয়নি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ শাখার পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা এক পত্রে বিস্তারিত তথ্য না দেওয়ার কারণ জানিয়েছেন। কিন্তু উল্লিখিত কারণ যুক্তিসংগত বলে আমি মনে করছি না। অতএব, আপনার কাছে এ ব্যাপারে আপীল করছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে আমি আমার কর্মস্থল পরিবর্তন করে প্রকাশিতব্য দৈনিক *সকালের খবর* পত্রিকায় যোগদান করেছি।

আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ : বর্তমান জাতীয় সংসদে পাস হওয়া তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদনের ২০ দিনের মধ্যে দেশের যেকোনো নাগরিকের সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য না দিয়ে তথ্য অধিকার আইন লঙ্ঘন করেছে। তা ছাড়া তথ্য না দেয়ার জন্য যে কারণ দেখিয়েছে তা যুক্তিসংগত নয়। এ কারণে আপিল করছি।

প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি : তথ্য অধিকার আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী তথ্য চেয়ে ২০ দিনের মধ্যে না পাওয়ার পর তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের আগে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে হবে। এ কারণে অভিযোগ দায়েরের আগে আপিল করছি।

আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যায়ন : আমি রফিকুল ইসলাম সবুজ, দৈনিক *সকালের খবর*-এর সিনিয়র রিপোর্টার (*সমকাল*-এর সাবেক সিনিয়র রিপোর্টার) আপিলে যে তথ্য উল্লেখ করেছি তা আমার জ্ঞানমতে সঠিক। তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

অন্য কোন তথ্য যাহা আপিল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপিলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন : আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলের বিষয়ে আমার কাছে আরও কোনো কিছু জানতে চাইলে আমি নিজে অথবা আমার মনোনীত প্রতিনিধি তা জানাবেন। কিন্তু আইন অনুযায়ী আপিলের পর ২০ কার্যদিবসের মধ্যে আমাকে তথ্য প্রদান অথবা দিতে না পারলে কারণ জানিয়ে চিঠি দিতে হবে। অথচ ২০ কার্যদিবসের বেশি হলেও আমি তথ্য পাইনি।

অন্যদিকে আমি গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছিলাম ২০১০ সালের ৪ নভেম্বর। কিন্তু যথাসময়ে তথ্য না পেয়ে আপিল করার পর দীর্ঘ ছয় মাসেও কোনো তথ্য পাইনি। কী কারণে তথ্য দেয়া হচ্ছে না, তা লিখিতভাবেও আমাকে

জানানো হয়নি গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এ অধিদপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো তথ্য কর্মকর্তাই নেই। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কেও কর্মকর্তাদের তেমন কোনো ধারণা ছিল না আমার আবেদন করার আগে। প্রধান প্রকৌশলীর স্টাফ অফিসারই তথ্যকর্মকর্তার কাজ করছেন বলে আমাকে জানানো হয়। তিনি মৌখিকভাবে আমাকে বারবার একই কথা বলেন, তা হলো আমার আবেদনের পর তথ্যগুলো চেয়ে প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সারা দেশ থেকে তারা তথ্য পাঠালে আমাকে একসঙ্গে করে তথ্যগুলো দেয়া হবে। আমি গণপূর্তের কাছে গত দুই বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরে কত টাকার উন্নয়ন বা সংস্কার কাজ করা হয়েছে, তার জোন-ওয়ারি হিসাব, এর মধ্যে কত টাকার কাজ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে এবং কত টাকার কাজ এলটিএম-এর মাধ্যমে করা হয়েছে তার বিবরণ, এলটিএম-এর মাধ্যমে ঢাকা জোনের কাজের বিবরণ, এ ছাড়া গত দুই বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের উন্নয়ন বা সংস্কারকাজ করার ক্ষেত্রে কী ধরনের অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে, অনিয়মের জন্য কোনো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে এর বিবরণ। কিন্তু ছয় মাসেও তথ্য দেয়া হয়নি। তবে এ বিষয়টি নিয়ে আমি আর শেষ পর্যন্ত কমিশনের কাছে অভিযোগ করিনি। তথ্য পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য পেতে গিয়ে আমার সামান্য যে অভিজ্ঞতা, তা হলো, এ আইনটি হওয়ার পর সাংবাদিকেরা দ্রুত তথ্য পেতে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কারণ আইন পাস হওয়ার পর সবাই আশা করেছিলেন খুব সহজে তারা তথ্য পেয়ে যাবেন। কিন্তু সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো। যেমন আগে কোনো কর্মকর্তার কাছে তথ্য চাইলে তিনি সহজেই আন-অফিশিয়ালি তথ্য দিয়ে দিতেন বা দেয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন কারও কাছে চাইতে গেলেই বলেন, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদন করুন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে দিয়ে দেব। কিন্তু আবেদন করার পর নানা অজুহাতে তথ্য পেতে দেরি হচ্ছে। আপিল করে বা কমিশনের কাছে অভিযোগ করে তথ্য পেতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ মাস সময় লেগে যায়। একজন রিপোর্টারের পক্ষে এত দিন অপেক্ষা করাটা আসলেই কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া সংসদ সচিবালয়ে আইনের আওতায় তথ্য চাইতে গিয়ে আমার যেটা মনে হয়েছে, কর্মকর্তারা বা কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে সাংবাদিকদের কাছে তথ্য দিতে ভয় পান। তাদের ধারণা, আনঅফিশিয়ালি তথ্য দিলে প্রয়োজন হলে পরবর্তী সময়ে তা অস্বীকার করার বা পত্রিকা অফিসে প্রতিবাদ পাঠানোর সুযোগ থাকে তাদের। কিন্তু লিখিতভাবে তথ্য দিলে এটা করা অসম্ভব হয়ে যাবে। তাই সাংবাদিকদের লিখিত তথ্য দিতে ভয় বা সংকোচবোধ কাজ করে কর্মকর্তাদের মধ্যে। এ কারণে নানা অজুহাতে তথ্য না দেয়ার চেষ্টা করেন তারা। আবার পরিচিত রিপোর্টার তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চাইলে মনে করেন, নিশ্চয়ই খারাপ কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। তা না হলে তিনি তো আন-অফিশিয়ালি তথ্য নিতে পারতেন, তা নিয়ে লিখিতভাবে চাইছেন কেন।

এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাকেও হতে হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে না পেলেও আনঅফিশিয়ালি কিছু তথ্য পেয়ে আমি একটি প্রতিবেদনের কাজ সম্পন্ন করেছি। তবে সাংবাদিকদের পরিবর্তে কোনো সাধারণ নাগরিক তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কিছুটা হলেও সহজে তথ্য পেয়ে যান বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। এ কথাও স্বীকার করেছেন কর্মকর্তারা। তারা বলেন, সাধারণ একজন নাগরিক তথ্য পেলে তিনি তা দিয়ে হয়তো তাদের কোনো ক্ষতি করবেন না। কিন্তু একজন সাংবাদিক এটা নিয়ে পত্রিকায় নেগেটিভ রিপোর্ট করলে তাদের সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

এসব কারণে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সাংবাদিকদের তথ্য পাওয়ার আগ্রহও অনেক কম। যেমন সংসদ বিটের আমিসহ মাত্র দুজন সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চেয়েছেন গত মে মাস পর্যন্ত সময়ে। এ বিষয়ে কারোর আগ্রহও তেমন একটা দেখা যায় না। আর সত্য কথা বলতে গেলে, আমিও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চাইতাম না, যদি না এমআরডিআই আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত না করত। তবে আমি মনে করি, সাংবাদিকদের বেশি বেশি করে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করতে হবে। এটা করা গেলে কয়েক বছর পর হয়তো দ্রুত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় থাকবে না। যেমন সংসদ সচিবালয়ের কাছে আমি গত ছয় মাসে তথ্য পাওয়ার জন্য বারবার আবেদন করায় তারাও বিষয়টিকে এখন সহজভাবে নিয়েছে। আমি আপিল করার কারণে কর্তৃপক্ষও শেষ পর্যন্ত তথ্য দিতে রাজি হলেও বিভিন্ন শাখা থেকে দিতে অপরাগতা প্রকাশ করছে নানা কারণ দেখিয়ে। আমার বিশ্বাস, এখন থেকে কেউ সংসদ সচিবালয়ের কাছে আইনের আওতায় তথ্য চাইলে তাকে হয়তো তথ্য পেতে স্পিকারের কাছে আপিল করার প্রয়োজন হবে না। স্পিকার আগেই দেওয়ার জন্য অনুমতি দিয়ে দেবেন। এভাবে সব দপ্তর বা বিভাগে সাংবাদিকেরা তথ্য চেয়ে আবেদন করলে কর্মকর্তারাও তথ্য দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন। একটা সময় আসবে, যখন সহজেই তারা অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তথ্য দিতে। এমআরডিআই-এর এক কর্মশালায় ভারতের দিল্লি থেকে প্রকাশিত আউটলুক ম্যাগাজিনের সিনিয়র সাংবাদিক সৈকত দত্তর অভিজ্ঞতা শুনে ভালো লেগেছে। তিনি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ভারতের একটি অধিদপ্তর থেকে তথ্য নিয়ে একটি সিরিজ প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। সৈকত দার পরামর্শ হলো, বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করা হলে দ্রুত না হোক, ধীরে ধীরে তথ্যগুলো পেতে থাকলে পর্যায়ক্রমে ভালো রিপোর্ট করার মতো তথ্য হাতে পৌঁছে যাবে। তখন আর কোনো রিপোর্টারকে ভালো রিপোর্টের অভাব বোধ করতে হবে না। আমিও একমত তার পরামর্শের সঙ্গে। উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি পাঁচটি দপ্তরে দুটি করে ভালো তথ্যের জন্য আবেদন করে তিন মাসের মধ্যে পাঁচটি তথ্যও পাই, তাহলে পাঁচটি ভালো প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব। এভাবে একের পর এক আবেদন জমা দিয়ে রাখলে পর্যায়ক্রমে তথ্য আসতে থাকবে। আর না পাওয়া গেলে কমিশনের কাছে তো অভিযোগ করার সুযোগ থাকছেই। কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে

একবার অভিযোগ দেয়ার পর যদি কমিশন তাকে তথ্য দেয়ার জন্য রায় দেয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের কাছে কেউ তথ্য চাইলে দ্রুত তথ্য দিয়ে দেবে, কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ভয়ে। তাই আমি মনে করি, তথ্য না পেলে অবশ্যই কমিশনে অভিযোগ করা উচিত। তাহলে পরবর্তী সময়ে তথ্য পাওয়া আরও সহজ হবে। পাশাপাশি আমাদের সহকর্মীদেরও উৎসাহিত করতে হবে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করার জন্য। কারণ আমি আমার বর্তমান ও সাবেক সহকর্মীদের মধ্যে তেমন কোনো আগ্রহ দেখিনি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কোনো দপ্তর থেকে তথ্য পাওয়ার আবেদন করতে। অনেকে এটাকে ডিসক্রেডিট বলেও মনে করেন। তাদের বক্তব্য, একজন সাংবাদিক তার সোর্সের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এর জন্য আবার আবেদনের প্রয়োজন কী। আবেদন করলে নিজের সোর্স নেই বলে মনে হবে। আমি সংসদ সচিবালয়ে তথ্যের জন্য আবেদন করেছি, এ কথা শুনে সংসদ বিটের অনেক বন্ধুই অবাক হয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সংসদে এক যুগের বেশি পার করে দিয়েছেন। সংসদ নিয়ে অনেক অনুসন্ধানী রিপোর্ট করে হইচই বাধিয়ে দিয়েছেন। আপনার এত সোর্স থাকার পরও কেন তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চাইতে গেলেন। এ নিয়ে কেউ কেউ সমালোচনাও করেছেন আমার। এসব কারণে অনেকে তথ্যের জন্য আবেদন করতে চান না। তবে আমি মনে করি, এই ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে এসে তথ্য অধিকার আইনকে আরও বেশি করে কাজে লাগাতে হবে।

Journos Lack Interest in RTI Application

Rafiqul Islam Sabuj, Senior reporter, Daily Shokaler Khobor

Then I was working as a reporter in vernacular daily Samakal. One evening my chief reporter informed me that the editor had assigned a special task to us – myself and my two other colleagues in the office. Non-government media development organisation MRDI had initiated a special project under which journalists would be oriented on application of Right to Information (RTI) Act for getting information. So as part of the

scheme all three of us from Samakal had an inception meeting with the task consultant Ralph Frammolino, a journalist and journalism trainer having expertise on RTI issue.

I have been covering parliament sessions for many years as a reporter. So I decided to file RTI application to the parliament seeking some information. Additionally, I also decided to file RTI application to Public Works Department (PWD) asking for some information. I submitted applications to these two institutions seeking some specific info on November 4, 2010.

My RTI Experience with Parliament

A few days after filling application to the parliament secretariat, I was told that it went missing and I needed to submit it again. I obliged and resubmitted an application on November 10, 2010. The information I asked for, on public interest, included; info about procurements in preceding 22 months of the current parliament, the names of the bidders awarded purchase tenders, statistics of entertainment bills sanctioned against the VIPs including Speaker, Deputy Speaker, Opposition Leader and Whips of the parliament, budget outlay and money spent in previous two years for maintenance of the national assembly building, and travel allowances taken by the MPs etc.

In the following two months I did neither receive any of the information I sought nor any communication whatsoever from the parliament secretariat. So I wrote to the Speaker on January 5, 2011 asking for the information. I was then furnished with partial information by the parliament secretariat on January 18, 2011. It was information only about a sum total of entertainment bills spent by the parliament VIPs in past one year but there were no specifics about who spent what amount. Besides I got nothing about rest of my queries. As I picked up the issue with an official concerned at the parliament secretariat he informed that as I sought the Speaker's intervention so the secretariat provided me with the volume of information as only directed by the Speaker and if I want more than I have to apply afresh. He further said he would have otherwise given me some info unofficially but as I had already sought the Speaker's

intervention he couldn't do so any more. So I applied afresh seeking all the information on January 31, 2011. On February 28, 2011 I received a letter from the RTI-designated official and director of the public relations wing of the parliament. He informed me through that letter that as audit was not completed yet it was not possible then for them to provide me with the information.

But as I couldn't subscribe to this excuse, I complained before the parliament secretary on March 31, 2011 claiming that the parliament secretariat had infringed into my right to information. It was the time when I left daily Samakal to join a new vernacular daily Shokaler Khobor. Few days later I got another letter from the parliament secretariat informing me that my appeal was not submitted in a proper way. The director of the public relations told me that I should have written to Speaker and not to the parliament secretary. Then just a few days afterwards I again appealed before the Speaker asking for the information.

I was supposed to get my desired information within 20 days of appeal submission or at least get a response showing causes of parliament not being able to furnish me with the information. But those 20 days exhausted and I am still in dark.

My RTI Experienc e with PWD

I filed another RTI application with the PWD on November 4, 2010 asking for some information but in the following six months I did receive nothing. There is no designated official at PWD to entertain the RTI applications. Prior to my application submission the PWD officials had almost no knowledge about RTI either. I was told that a staff officer of the PWD chief engineer was carrying out the responsibility of RTI-designated official there. Whenever I inquired about the information I sought for, he parroted the same reply that letters had been dispatched to all executive engineers' offices from the chief engineer's office asking for the info and once those are made available I would get the information.

I had asked for some of the information related to PWD-carried out development and repair works in the previous two years and whether the department had dealt with any irregularities and had

taken any punitive measures against any contractor or department official for such irregularities. In last six months I did not get any information from PWD whatsoever. I did not submit an appeal with the Information Commission either. I am still waiting for the PWD final response.

Conclusion

The little experience I gained courtesy this special exercise – gave me the realization that enactment of RTI has not yet made journalists' life easy. Rather the reverse. During this teething period of RTI exercise, journalists are suffering lot in gaining information on time. Previousely they could manage getting some info at least through unofficial means (officials divulging info on condition of anonymity).

But now once some reporters have just started filing applications seeking information, often they are not getting so in five/six months and those 'unofficial' channel is 'shut' too because the sources became overcautious in sharing info unofficially with the journalists. So many a journalists think it was better to pursue the trade 'as usual' instead of being so formal and seeking info in black and white. For instance till May 2011, to the best of my knowledge, only two reporters including myself sought information through RTI applications from the parliament. Many of the journalists lack interest in applying RTI for getting information.

But I consider even if journalists start filing applications in various institutions at a time today and start getting some information in five months time, one by one, they would still be better off in making some good investigative reports. I believe in the continuation of our efforts now journalists may no longer require seeking the Speaker's intervention rather they may start getting information in the first instance upon submitting their applications properly to the parliament secretariat. Besides, the option of appealing before the Information Commission is always there once one exhausts all preceding steps of getting information.

আইনে মোড়া তথ্য এবং অধিকার অর্জনের পালা

দীপঙ্কর লাহিড়ী, যুগ্ম বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সমকাল

আমরা জানি, পৃথিবীতে দুই ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে।

এক. জীববৃত্তিক

দুই. বুদ্ধিবৃত্তিক

জীববৃত্তিক প্রাণী শুধু জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি থেকে পাওয়া প্রক্রিয়া প্রাত্যহিক অনুসরণ বা সম্পাদন করে মাত্র। চিন্তাশীল কোনো কাজে তাদের অংশগ্রহণ বা ক্ষমতা নেই। পক্ষান্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পাশাপাশি বুদ্ধিগত কাজও সম্পাদন করে। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক জীব। সেই আদিম যুগ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মানুষ কৌতূহলী। মানুষের কৌতূহল, জানার অধীর আগ্রহের ফল আজকের রূপান্তরিত আধুনিক বিশ্ব। আদিম যুগ থেকে মানুষ নিজে জানার পাশাপাশি অন্যকেও জানাতে চায়। সেই ধারাবাহিকতা এখনো চলছে। মানুষের কৌতূহল মেটানোর অনেকটা দায়িত্ব পালন করেছে গণমাধ্যম। আর আজকের দুনিয়ায় মানুষকে জানানো একটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য। তথ্য জানা আধুনিক মানুষের সংরক্ষিত অধিকার। আমদের দেশের অন্য মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের পাশাপাশি তথ্য জানার অধিকারও সমান গুরুত্বে চলে এসেছে। সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' বিল পাস হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ এখন পরস্পরকে তথ্যবিনিময়ের অধিকারে যুগলবন্দী। এখন প্রয়োজন আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও তথ্য প্রাপ্তির সহজীকরণ।

'সরকারি/বেসরকারি কর্তৃপক্ষের তথ্য জানতে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করুন। আরও জানতে ব্রাউজ করুন– www.infocom.gov.bd'

বাংলাদেশ টেলিফোন রেগুলেটরি কমিশন থেকে এ ধরনের একটি শর্ট মেসেজ প্রায়ই আমাদের মুঠোফোনে পেয়ে থাকি। সংবাদপত্রের কর্মী হিসেবে এই ছোট্ট মেসেজটি একসময় আমার খুব ভালো লাগত। ভাবতাম, এই মেসেজ পাঠানোর মাধ্যমে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। যখন 'তথ্য জানার' আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হলাম, তখন উপলব্ধি করতে থাকলাম, আইনের মধ্য থেকে তথ্য জানা একটি জটিল বিষয়।

২০০৯ সালের ২০ নম্বর আইন হিসেবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করার পর আমরা দেশের সাধারণ জনগণ 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' গেজেট হিসেবে পাই। এর আগে থেকে অবশ্য বিভিন্ন মাধ্যমে এই আইনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়ে আসছিল। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করার জন্য এই আইন প্রণীত হয়েছে। দুই ভাগে ভাগ হয়েছে আইনের মহৎ লক্ষ্য।

ক. তথ্যের অবাধ প্রবাহ।

খ. জনগণের জন্য তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)-এর প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে এ আইনের এ দুটি বিষয়ে আমার দুই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।

ক. তথ্যের অবাধ প্রবাহ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আইন অনুসরণের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ও 'জটিল প্রক্রিয়া' বলে মনে হয়েছে।

প্রকল্পের সূচনাপর্বে এমআরডিআই-এর সঙ্গে প্রথম বৈঠকে (২৬ অক্টোবর ২০১০) আলোচনার এক অংশে সিনিয়র সাংবাদিক সুকান্ত গুপ্ত অলক বলেছিলেন, তার পরিচিত কক্সবাজারের এক সাংবাদিক তাকে জানিয়েছিলেন, আইন অনুযায়ী একটি সাধারণ তথ্য পেতে তাকে দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও সময় ব্যয় করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে আবেদনকৃত তথ্যের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি (কক্সবাজারের সেই সাংবাদিক) অনেক আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন 'সোর্স'-এর মাধ্যমে।

সেদিন এই কথাটি আমার কাছে খুব সহজ 'বাক্যগুচ্ছ' মনে হলেও যখন তথ্য অধিকার আইনের গেজেটটি পড়া শুরু করলাম এবং প্রকল্পের আমার দুই সহকর্মী বন্ধু দৈনিক *সমকাল*-এর সিনিয়র রিপোর্টার রাশেদ মেহেদী ও রফিকুল ইসলাম সবুজের (বর্তমানে *সকালের খবর*-এ কর্মরত) মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা জানতে থাকলাম, সেদিন থেকে কক্সবাজারের সেই সাংবাদিক বন্ধুর উপলব্ধিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আমার কাছে বিবেচিত হতে থাকল।

আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—
তথ্য অধিকার আইনের ২০০৯-এর ধারা '৭'-এ বলা হয়েছে 'কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়'। এর একটি উপধারা (ন)-এ বলা হয়েছে, 'মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনায় সারসংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপে বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য'। 'তবে শর্ত যে, মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণে যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে।' 'আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তার কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।'

সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে আমি দেখেছি, মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের আগের দিন একজন রিপোর্টার পরের দিনের মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের অ্যাজেন্ডা এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত (অনেক ক্ষেত্রে আংশিক) রিপোর্ট ডেস্কে জমা দেন। আইন/প্রথা অনুযায়ী আগের দিন বৈঠকের অ্যাজেন্ডা বা বিস্তারিত জানা সম্ভব নয়। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর (ন) উপধারা অনুযায়ী একজন রিপোর্টারের এসব পাওয়ার আনুষ্ঠানিক মাধ্যম নেই। তার পরও প্রত্যেক সপ্তাহে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের দিন সকালে আমরা সংবাদপত্রের পাতায় এ সংক্রান্ত আগাম প্রতিবেদন পড়ার সুযোগ পাই। আমরা জানি, 'গোপন সোর্স' (অনুল্লেখ সূত্র)-এর মাধ্যমে সাংবাদিকরা তথ্যগুলো পেয়ে থাকেন।

উল্লেখ্য, আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাংবদিকতায় 'গোপন সোর্স'-এর 'ব্যবহার' বোঝাতে বিষয়টি উল্লেখ করেছি, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত বা পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

সহকর্মী রাশেদ মেহেদী গত বছর ৫ ডিসেম্বর (২০১০) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবিলায় গঠিত তহবিল সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫ জানুয়ারি (২০১১) মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, তখন এ ধরনের তথ্য প্রদানের জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়নি। আরও জানানো হয়, শিগগিরই কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। পরে আরেকটি আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল, রাশেদ মেহেদীর আবেদনে যে বিষয়গুলো জানতে চাওয়া হয়েছিল, একটি সহযোগী দৈনিকে একই বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আমরা দেখেছি, নিজস্ব গোপন সোর্স ব্যবহার করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। রাশেদ মেহেদী যে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, সহযোগী সংবাদপত্রের ওই সাংবাদিক গোপন সোর্সের মাধ্যমে তার বড় একটি অংশ পাঠককে জানাতে সমর্থ হলেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করি যে, নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে খুব স্বল্প সময়ে এবং সহজ প্রক্রিয়ায় তথ্য জানা গেলেও সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার বা তোলার

সুযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের কাছে ভুল তথ্য পৌঁছারও আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। সুতরাং আমি মনে করি, এই আইন পাস হওয়ার দুই বছর পর এসে তথ্য পাওয়ার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো রয়েছে তা দূর করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের মাধ্যমে দ্রুত মনিটরিং সেল গঠন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এর মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সাংবাদিকতা আরও বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এই আইনের বড় প্রভাব পড়বে।

খ. জনগণের জন্য তথ্য চাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকরণ

তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিকার নিশ্চিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দেশের জন্য ক্ষতিকর, এমন কোনো তথ্য প্রাপ্তি ছাড়া সব ধরনের তথ্য দেশের একজন সাধারণ নাগরিক অবশ্যই পাওয়ার অধিকার ভোগ করবেন।

ভাবনার বাইরে যে আইন

সংবাদকর্মী হিসেবে কাজ করা সত্ত্বেও এবং তথ্য অধিকার আইন নিয়ে দেশের একটি নতুন আইন সম্পর্কে জানা থাকলেও এর বিশদ এর আগে ভাবা হয়নি। এমআরডিআই-এর প্রকল্প আমাকে সেই ভাবনার জায়গায় নিয়ে গেছে, যা আমার সাংবাদিকতা-জীবনের একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে উল্লেখ থাকবে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে যে সুন্দর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সম্ভব, তা এই প্রথম আমার গোচরে এল। বিশেষ করে, বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক রালফ ফ্রেমোলিনো তার অনুসন্ধানী চোখ দিয়ে আমাদের যেভাবে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা আমার কর্মজীবনে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। অত্যন্ত বিদগ্ধ, বিচক্ষণ এই মানুষটির সঙ্গে বেশ কয়েকবার আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক আলাপ, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করতে সহায়তা করেছে। অনেকবার মনে হয়েছে, আমার দেশের একটি আইন সম্পর্কে ভিনদেশের একজন মানুষের কাছ থেকে জানতে হচ্ছে, এ বড় লজ্জার। আবার ভেবেছি, আমার সাংবাদিক পরিমণ্ডলে অধিকাংশ ব্যক্তিই এ আইন সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। বিশেষ করে, যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন, সেসব রিপোর্টার বন্ধুর অধিকাংশই এই আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাননি। সুতরাং এ লজ্জা শুধু আমার একার নয়। গোটা সংবাদপত্র-শিল্পের জন্য এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক।

প্রকল্পের শুরুতে আমার সহকর্মী বন্ধু রাশেদ মেহেদী দুটি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলে মন্ত্রী বরাবর আবেদন করেছিলেন, যেটি ভুল ছিল। এই ভুলের একমাত্র কারণ, আইন ভালোভাবে না বুঝে না জেনে আবেদন করা। মেন্টর হিসেবে এই ব্যর্থতার দায় আমারও। আইনটি সম্পর্কে আগে থেকে আরও ধারণা নেওয়া আবশ্যক ছিল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অফিসের প্রাত্যহিক কাজের সঙ্গে সমন্বয় করতে না পারায় রাশেদ মেহেদী দ্রুত সবকিছু করতে চেয়েছেন, যা আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। আবেদন/তথ্য প্রাপ্তি/সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা/সাফল্য এগুলো অবশ্য

আমাকে নিয়মিত অবহিত করতেন তিনি। এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো অতি সহজেই অবহিত হয়েছি বা বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেয়েছি।

সহকর্মীদের ভাবনা

সমকাল-এর সম্পাদক গোলাম সারওয়ার এ আইন সম্পর্কে খুবই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। তার মতে, এই আইন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম। আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সংবাদকর্মীদের অজ্ঞতাকে তিনি অবশ্য নেতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করেন। তার মতে, আইনের সুবিধা পেতে সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি। নইলে কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে বাংলাদেশের মানুষের অধিকারের সংরক্ষক এই গুরুত্বপূর্ণ আইন।

সমকাল-এর প্রধান প্রতিবেদক শাহেদ চৌধুরী বাংলাদেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনকে ততটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন না। তার মতে, দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে সাংবাদিকতায় এই আইন কোনো প্রভাব বা সুবিধা সৃষ্টি করতে পারবে না। *সমকাল*-এর সাবেক বার্তা সম্পাদক বর্তমান সহযোগী সম্পাদক সবুজ ইউনুস এই আইন সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তার মতে, সাংবাদিকতায় এই আইন আংশিক প্রযোজ্য। তিনি বলেন, তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই আইন কতটুকু ভূমিকা রাখবে, তা স্পষ্ট নয়। *সমকাল*-এর বর্তমান বার্তা সম্পাদক আবু বকর চৌধুরী অবশ্য বলেছেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এবং দেশের জনগণের সব রকম অধিকার নিশ্চিতকরণে এই আইনের ভূমিকা অনেক। তিনিও এই আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানানো ও সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এমআরডিআই-এর প্রকল্পে কাজ শুরু করার পর আমি *সমকাল* অফিসে একটি পরিবর্তন লক্ষ করেছি। *সমকাল*-এর অপেক্ষাকৃত জুনিয়র সাংবাদিকদের (রিপোর্টার) মধ্যে এই আইন সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। তারা প্রায়ই কৌতূহলী মন নিয়ে আমার কাছে নানা প্রশ্ন করেন।

আমি মনে করি, প্রাত্যহিক সাংবাদিকতার চেয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এই আইন সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে। রালফ ফ্রেমোলিনো প্রায়ই বলতেন, দীর্ঘ সময় মাটি খনন করে যেভাবে নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা হয়, ঠিক সেইভাবে 'ডিগিং' করে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে 'খবর' বের করে নিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলতেন, প্রয়োজনে 'খামচে' ধরতে হবে, কেন তথ্য পাওয়া যাবে না। যদি নাছোড়বান্দা হয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে খামচে ধরা যায় তবে অবশ্যই কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য হবে।

আমি মনে করি, তার এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার/প্রশাসন/বেসরকারি প্রশাসন/সংস্থা এসব স্থান থেকে 'ডিগিং' করে প্রাত্যহিক সাংবাদিকতা সম্ভব নয়।

এমআরডিআই-এর এই প্রকল্পে রালফ ফ্রেমোলিনোর পাশাপাশি ভারতীয় বাংলাভাষী সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইন বিশেষজ্ঞ আউটলুক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক সৈকত দত্তের সঙ্গে দুই দিনের আলাপ ছিল, এই প্রকল্পের ভিন্ন অথচ উদ্যোগ। প্রতিবেশী দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আমাদের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার জনপ্রশাসন এবং সরকারের মন্ত্রীদের ভূমিকা এবং তার কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা আমাকে দৃঢ় ও গতিশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভারতের চাল কেলেঙ্কারির খবর জানার পাশাপাশি সেই খবর তৈরির নেপথ্য গল্প জানা হতো না, যদি এমআরডিআই সৈকত দত্তকে আমন্ত্রণ না জানাত।

পরামর্শক হিসেবে রালফ অত্যন্ত উঁচু মানের। এর পরও আমার কাছে মনে হয়েছে, বাংলাদেশের বাস্তবিক পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে তাকে পীড়া দিচ্ছিল। বাংলাদেশের সরকারি অফিসের সঙ্গে সাংবাদিকদের যোগাযোগ এবং কাজের ধরন সম্পর্কে ধারণাগত কিছু সীমাবদ্ধতা এর অন্যতম কারণ। প্রকল্পের একপর্যায়ে গিয়ে দেখা যায়, রাশেদ মেহেদীর একটি অবেদনের নির্ধারিত ২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঢাকা সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ মৌখিকভাবে আরও ১০ দিন সময় চাইলে রালফ আইনে সীমাবদ্ধ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে রাশেদ মেহেদী পড়েছিলেন দোটানায়। কেননা সসুম্পর্ক বজায় রেখে দীর্ঘদিনের প্রথাগত সাংবাদিকতা এবং আইন এক সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। এ অবস্থায় আমিও কিছুটা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে পড়েছিলাম। রালফ প্রথমে আইন অনুযায়ী আপিল করার জন্য জোরালো সুপারিশ করলেও পরে অবশ্য বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন। অন্য একটি তিক্ত অভিজ্ঞতাও রয়েছে রালফের সঙ্গে। প্রকল্পের একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল, অফিসের অ্যাসাইনমেন্ট কভার করতে গিয়ে প্রকল্পের কাজে সময় দিতে ব্যর্থ হলেন রাশেদ মেহেদী। এমন দু-একটি ক্ষেত্রে রালফ ছিলেন দৃঢ়। তাকে বোঝানো কঠিন হয়ে পড়েছিল যে, তখন সারা দেশে অনুষ্ঠিত পৌরসভার নির্বাচন আমাদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু।

প্রকল্পের প্রত্যাশা

শুরুতেই এ নিয়ে প্রত্যাশা বেশি দূর ছিল না। এর কারণ হলো, আইন সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা না থাকা। যে বিষয়ে আমার জানার ঘাটতি আছে সেই বিষয়ের কাছে প্রত্যাশা কতটুকুই বা থাকতে পারে? ধীরে ধীরে যখন আইনটি মজ্জাগত এবং বাস্তবিক প্রয়োগের সমস্যা/ফল হস্তগত হতে থাকে তখন থেকেই এই প্রকল্পের ব্যাপারে প্রত্যাশা জন্ম নিতে থাকে। একপর্যায়ে মনে হয়, আমার পেশাগত উৎকর্ষসাধনে প্রকল্পলব্ধ অভিজ্ঞতার সহায়তা নিতে পারব। সহকর্মীদের সঙ্গে এই আইন এবং প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারব।

নয় বিস্ময় এক্ষুনি

তথ্য অধিকার আইনে বিস্মিত হওয়ার মতো কোনো বিষয় অন্তত এই প্রকল্পের অধীনে আমি খুঁজে পাইনি। একটি বিষয়, যা আমাকে মর্মাহত এবং আশাহত করেছে, তা

হলো– আইনের প্রয়োগ, ব্যবহার, সুবিধাপ্রাপ্তি– এসব ক্ষেত্রে এখনো সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি হয়নি। সরকারি-বেসরকারি অনেক দপ্তরেই 'তথ্য প্রদান কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হয়নি।

তথ্য কমিশনকে বলি...

তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার দীর্ঘ সময় পরও বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও গ্রামীণ ব্যাংকে 'তথ্য প্রদান কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হয়েছিল না। সম্প্রতি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের ব্যাপারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সমকাল-এর সিনিয়র রিপোর্টার রাশেদ মেহেদী উপস্থিত ছিলেন। ড. ইউনূসকে তিনি বলেন, 'গ্রামীণ ব্যাংক বা আপনার বিষয়ে তথ্য জানতে আমরা নির্দিষ্ট কাউকে খুঁজে পাই না। এমনকি সম্প্রতি বিদেশি সংবাদমাধ্যমের একজন কর্মী আপনার সম্পর্কে জানতে গ্রামীণ ব্যাংকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউকে পাননি। আপনার উপস্থিতি সহজলভ্য না হওয়া এবং আপনার ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ না থাকায় সাংবাদিকদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।' এর পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন (১২ ডিসেম্বর/২০১০) সংবাদ সম্মেলনেই দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান জান্নাত কাউলাইন। গ্রামীণ ব্যাংক বর্তমানে আলোচিত একটি ইস্যু হওয়ায় আমি এ প্রতিষ্ঠানকে উদাহরণ হিসেবে টানলাম মাত্র। আমার ধারণা, এ ধরনের বাস্তবতা দেশের অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে এখনো বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের কোনো ভূমিকা থাকা উচিত কি না, তা ভেবে দেখা দরকার বলে আমি মনে করি।

একটি প্রস্তাবনা মাত্র

পরিশেষে বলতে চাই, গুরুত্বপূর্ণ এই আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানানোর পাশাপাশি আইনসংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের দক্ষতা, উৎকর্ষসাধনের স্বার্থে সচেতনতা ও অবহিতকরণ কর্মসূচি নেওয়া দরকার। এই কর্মসূচি সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে একযোগে সম্পাদন হতে পারে। আমার উপলব্ধি থেকে এটুকু বলতে পারি, আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংকট, আর্থসামাজিক দুর্বল কাঠামো, মানুষের প্রতি মানুষের আস্থাহীন অবস্থান– এ সবই দূর হতে পারে একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে। আর এই ধরনের একটি সমাজ বিনির্মাণে অন্যতম ভূমিকা রাখবে তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন।

এমআরডিআই-এর এই প্রকল্প থেকে উৎসারিত অভিজ্ঞতা থেকে একটি সুপারিশমালা তুলে ধরতে চাই। তা হলো : রাষ্ট্র/সরকার থেকে শুরু করে ব্যক্তিপর্যায় পর্যন্ত একটি প্রাতিষ্ঠানিক সেতুবন্ধ তৈরি করা, যার মাধ্যমে গোটা দেশে গড়ে উঠবে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবিক প্রায়োগিক, সুবিন্যস্ত, শক্তিশালী, জবাবদিহিমূলক অবকাঠামো। সে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি স্তরে দায়িত্ব পালন করা যেতে পারে।

১. তথ্য মন্ত্রণালয়

২. তথ্য অধিদপ্তর

৩. তথ্য কমিশন

৪. পিআইবি

৫. গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান

   ক. সংবাদপত্র/ইলেকট্রনিক মিডিয়া

   খ. গণমাধ্যমবিষয়ক বেসরকারি সংস্থা

৬. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান

৭. ব্যক্তিপর্যায়

এই স্তরগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে এ ব্যাপারে কাজ সম্পাদন করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে। যার সহযোগিতায় থাকবে তথ্য অধিদপ্তর। মূল দায়িত্ব পালন করবে তথ্য কমিশন। প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) তার নিয়মিত কার্যক্রমে (সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ) তথ্য অধিকার আইনকে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে। সংবাদপত্র/ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। গণমাধ্যমবিষয়ক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান আরও ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তারা একদিকে পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান ও জনগণকে তথ্য জানার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। অন্যদিকে তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে এর আইনি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এর ফলে তথ্যের আদান-প্রদান প্রক্রিয়া মসৃণ-সরল হয়ে উঠবে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সারা দেশে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিজেরা তাদের তথ্য সাধারণ মানুষকে জানানোর মধ্য দিয়ে জবাবদিহিমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিপর্যায়ে সচেতনতা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি। একজন নাগরিক এই আইন বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করার পর তার অধিকার অর্জনের ব্যাপারে আরও সচেতন হয়ে উঠবে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের উচিত, নিজে জানা এবং একজন করে হলেও এই আইন সম্পর্কে অন্যদের জানানো।

একটি নতুন দুয়ার এবং কৃতজ্ঞচিত্ত ধন্যবাদ

দিন-তারিখ এ মুহূর্তে মনে নেই। একদিন সকালে আমার কর্মস্থল *সমকাল*-এ এসে সম্পাদকের কক্ষে প্রাত্যহিক পরিকল্পনা সভায় যোগ দিই। কিছু সময় পরে সম্পাদক বললেন, এমআরডিআই তথ্য অধিকার বিষয়ে একটি ফেলোশিপের আয়োজন করেছে। সেখানে বিশ্বব্যাংকের একজন পরামর্শক থাকবেন। এরপর তিনি এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার জন্য আমার নাম ঘোষণা করলেন। একই সঙ্গে বললেন, 'আরও দুজন রিপোর্টার এখানে কাজ করবেন, যাদের তোমরা নির্বাচিত করবে।' পরে অবশ্য সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করে রাশেদ মেহেদী ও রফিকুল ইসলাম সবুজকে নির্বাচিত করা হয়। প্রকল্পের কাজ শুরুর একপর্যায়ে রফিকুল ইসলাম সবুজ নতুন দৈনিক *সকালের খবর*-এ যোগ দেন। এ ব্যাপারে এমআরডিআই-এর মুকুর ভাই এক বৈঠকিতে দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে বলেছিলেন, 'আপনি সবুজকে হারাচ্ছেন।' পরে

আমার মনে হয়েছে, সেদিন যদি আমি সবুজকে না 'হারাতাম' তাহলে হয়তো আমার জানার সুযোগ আরেকটু বিস্তৃত হতো।

এই প্রকল্পে আমাকে সংযুক্ত হতে সুযোগ দেওয়ায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই সমকাল-এর সম্পাদক গোলাম সারওয়ারকে। এরপর ধন্যবাদ জানাই আমার সব সহকর্মীকে, যারা কষ্ট স্বীকার করে এই প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এ ছাড়া এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান মুকুর ও তার প্রতিষ্ঠানের সব বন্ধু এবং বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক রালফ ক্রেমোলিনোকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই, যাদের নিয়মিত পরামর্শ এবং দিক-নির্দেশনা তথ্য অধিকার সম্পর্কে আমার বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। বিভিন্ন সময়ে সেমিনার বা আলোচনা সভায় উপস্থিত সাংবাদিক সুকান্ত গুপ্ত অলক, তথ্য অধিকার আইন বিশেষজ্ঞ অনন্য রায়হান ও ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলমসহ অন্যদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমার পেশা ও ব্যক্তিজীবনে সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। সবার মঙ্গল কামনা করি।

Long Way to Go

Dippnker Lahery, Joint News Editor, Daily Samakal

"Apply to the designated officials for getting information from the government and non-government organizations. To learn further please browse - www.infocom.gov.bd."

We're by now familiar in getting such short messages in our mobile phones from the Bangladesh Telephone Regulatory Commission. But never did I think that, in practice, it would be so cumbersome to access any information we need.

We got the Right to Information (RTI) Act passed in our country in 2009. However, courtesy an MRDI (non-government media development

organization) RTI exercise involving some media people, of which I became a part too, I gained some insights about the practical applications of the Act.

To my understanding this Act is mainly aimed at ensuring free flow of information and establish people's right to access information.

I (as an in-house mentor) and two of my reporting colleagues (one of them left Samakal recently to join another new vernacular daily Shokaler Khobor) had an inception meeting with MRDI on October 26, 2010. In the following few months my reporting colleagues filed several RTI applications seeking information from different public offices only to gain a little.

I can cite a few examples of the incidents/developments they (reporters) experienced from this special exercise over the last six months or so. My colleague Rashed Mehedi filed an RTI application to Forest and Environment Ministry on December 5, 2010 to get some info on use of climate fund. On January 25, 2011 the ministry informed him that no authority (designated official/info desk setup etc) was established in that ministry yet to entertain such queries. But it assured that a mechanism to do so was in the offing and the ministry requested the reporter to apply for information again. In few days time we found out that the issue on which my reporting colleague wanted to make report by taking info from the ministry, had already been divulged and reported in another national daily. They got the info through 'sources' talking in exchange of anonymity.

Here we can see that many a reports can be produced using anonymous sources but sometimes the practice compromises authenticity. Whereas, if information is gained through RTI applications the reports can be prepared on more sound basis. So we need to remove the roadblocks and make the information easily available through the RTI applications.

Another issue I like to raise here - that is about our own understanding about the law itself and knowledge about its proper applications. Thanks to my exposure with consultant Ralph Frammolino under this special project - I got to know that many of

our journalist friends actually lack basic understanding of RTI Act, not to speak of its proper applications.

At the very outset one of the colleagues filed two of his RTI applications to ministers concerned, but those applications were supposed to be addressed to the RTI-designated officials of the ministries concerned. This mistake was committed due to ignorance of the law and its prescribed procedures. As a mentor I can't also shrug off my responsibilities here.

Among the rank and file of my professional colleagues I observed mixed reactions about the effectiveness of RTI tools. While some are in all praise of the law and consider it's a nice vehicle to gather information, otherwise inaccessible, and make some good investigative reports, the others consider it a cumbersome, time-consuming (time-wasting too) process. The second group also argues that in way or the other the newsmen can still manage getting those 'inaccessible' information through anonymous sources.

I also found it very useful that we had the chance to gain from the RTI experiences of Indian journalist Saikat Dutt, whose investigative reports on Indian rice trade scam considered as a success of proper applications of RTI.

At last I would like to recommend that there should be moves to make people aware about the enactment of RTI Act. Besides, the professionals directly involved with the process needed to be further trained up for the benefit of gaining the maximum out of the RTI Act.

There should an institutional coordination allowing people to get the fruits of the RTI. The institutions those can play vital roles in such coordinated efforts are; Ministry of Information, Press Information Department, Information Commission, Press Institute of Bangladesh (PIB), media outlets (both print and electronic), media-related private entities, non-government development organizations and individual concerned.

তথ্য অধিকার আইন এবং আমার অভিজ্ঞতা

জিয়াউল হক স্বপন, বার্তা সম্পাদক, দি ডেইলি স্টার

তথ্য অধিকার আইনটি বাংলাদেশে নতুন। মাত্র দুই বছর আগে কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নিরলস সংগ্রামের ফসল এ আইনটি জাতীয় সংসদে পাস হয়। তারপর শুরু হয় এর বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া। পাশাপাশি আইনটি সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তোলারও প্রয়াস চলতে থাকে। যারা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং এখনো আছেন, তাদের মতে, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর মধ্যে রয়েছে আইনটি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব আর আমাদের দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য না দেয়ার পুরোনো মানসিকতা। আশার কথা হলো, তথ্য না দেয়ার এ সংস্কৃতিতে খুব ধীরে ধীরে হলেও একটা পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইনটি সত্যিকার অর্থে গণমানুষের কাজে আসুক, এটা আমাদের সবার প্রত্যাশা। আর গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে আমাদের আরেকটি প্রত্যাশা হলো সাংবাদিকরা আইনটি ব্যবহার করে ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করবেন, যা জনগণের অধিকার, স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই জরুরি। গত দুই বছরে এ প্রত্যাশা কতটা পূরণ করা হলো, তা জানার জন্যই মূলত এমআরডিআই ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইনস্টিটিউট গণমাধ্যমকর্মীদের সহযোগিতায় এ কাজটি শুরু করে। গত বছরের শেষ দিকে দুটি জাতীয় দৈনিক এবং একটি টেলিভিশন চ্যানেলের কিছু সাংবাদিককে এ কাজটিতে সম্পৃক্ত করা হয়। ডেইলি *স্টার* পত্রিকার তিনজন সাংবাদিকের মধ্যে আমি ছিলাম অন্যতম। আমার দায়িত্ব ছিল নিউজ ডেস্ক থেকে আমার সহকর্মী দুজনের কাজে সহায়তা করা।

আমার দুজন সহকর্মী রিপোর্টার এমরান হোসেন ও পরিমল পালমা শুরুতেই তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কয়েকটি সরকারি দপ্তরে তথ্যের জন্য আবেদন জানান। উদ্দেশ্য, সেই তথ্য ব্যবহার করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা। কিন্তু শুরুর দিকে তাদের অভিজ্ঞতা ভালো ছিল না। সরকারি কর্মকর্তারা তাদের আশানুরূপ সহযোগিতা করেননি, তথ্য দিতে চাননি। এমনকি তথ্যের জন্য যে আবেদনগুলো করা হয়েছিল, তার জবাব দেয়ারও তাগিদ ছিল না তাদের। কেউ কেউ তথ্য দিয়েছেন, কিন্তু তা ছিল অসম্পূর্ণ। তথ্য না পেয়ে আমার দুই সহকর্মী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেছেন, সেখানেও একই অভিজ্ঞতা। তথ্য না দেয়া, সময়ক্ষেপণ, কোনো জবাব না দেয়া। শেষ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ করতে হয়েছে তাদের। কমিশন তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে। তবে এর পরও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পাওয়া যায়নি। সব তথ্য তাদের কাছে ছিল না। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি শুরু করা হয়েছিল, সেখানে খুব বেশি এগোতে পারেননি তারা। একটা ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য যে তথ্য দরকার ছিল, তা পাওয়া যায়নি। আমাদের হাতে যা ছিল, তা দিয়ে হয়তো প্রতিবেদন করা যেত, কিন্তু সেটা খুব বেশি গভীরতাসম্পন্ন হতো না।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই বাধাগুলো আসবে, এটা অনেকটাই ছিল প্রত্যাশিত। কারণ, তথ্য আইনের ব্যবহার সবে শুরু হয়েছে। সবকিছুতে অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগবেই। কিন্তু পাশাপাশি গণমাধ্যমের নিজস্ব কিছু সমস্যাও রয়েছে, যা রিপোর্টারের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা যারা রিপোর্টারদের বিভিন্ন দায়িত্ব দিই, তারা রিপোর্টারকে যথেষ্ট সময় দিই না। একটা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য রিপোর্টারকে যতটা সময় দেয়া দরকার, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা সেটা পান না। আমাদের নিউজ রুমের সংস্কৃতি হলো, একজন রিপোর্টারকে নানা কাজে ব্যস্ত রাখা। দিনের নিয়মিত কাজগুলো করতে গিয়ে তারা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য সময় দিতে পারেন না, এটাই বাস্তবতা।

তবে আমাদের সদিচ্ছার অভাব ছিল না। আমরা চেষ্টা করেছি তাদের কিছুটা হলেও ঝামেলামুক্ত রাখার। হয়তো সেটা যথেষ্ট ছিল না। আমরা তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার নিয়ে তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আলোচনা করেছি। যারা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সফল হয়েছেন, তাদের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছি। অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছি। তাদের পরামর্শ নিয়েছি। এখানে আমি বিশেষ করে ভারতের সাংবাদিক সৈকত দত্তের কথা উল্লেখ করতে চাই। আমাদের রিপোর্টারদের সামনে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তাকে। রিপোর্টারদের জন্য নিঃসন্দেহে এটা ছিল প্রেরণাদায়ক। আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে উপদেষ্টা হিসেবে রালফ আমাদের অনেক সময় দিয়েছেন। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক হিসেবে তার পরামর্শ ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। ইনস্টিটিউটের আরও দু-একজন কর্মকর্তার সঙ্গে আমাদের মতবিনিময় হয়েছে। তাদের কাছ থেকেও আমরা দিক-নির্দেশনা পেয়েছি।

আমাদের এই অভিজ্ঞতার সারমর্ম করলে যা দাঁড়ায়, তা হলো পুরো ব্যাপারটি ছিল একটা শেখার প্রক্রিয়া। আমরা এখনো শিখছি, কীভাবে আইনটিকে ব্যবহার করা যায়। এখানে বেশিরভাগ অভিজ্ঞতাই হয়তো নেতিবাচক। কিন্তু ইতিবাচক দিকগুলোকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। আমরা দেখেছি, পরিবর্তনের একটা ধারা সূচিত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের মানসিকতা আর আগের মতো নেই। যারা কিছুদিন আগেও মনে করতেন, তথ্য তাদের একচেটিয়া অধিকার, তারা এখন জানেন এবং বোঝেন যে তথ্য জনগণের জন্য, জনগণকে তথ্য দিতে তারা বাধ্য। সাধারণ মানুষও এখন জানতে পারছেন যে তাদের তথ্য পাওয়ার অধিকার এখন আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত। আর সাংবাদিকদের মধ্যেও এই আইনটির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে।

সবশেষে আমি বলব, আমাদের এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা থেকে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পুরো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। আমরা যা শিখেছি, সেটা ভবিষ্যতে অবশ্যই কাজে লাগবে। এরপর আমরা যখন তথ্যের জন্য সরকারি দপ্তরে আবেদন করব, তখন ছোটখাটো ভুলের অজুহাত দেখিয়ে কেউ আমাদের তথ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। অযথা সময়ক্ষেপণ করতে পারবেন না। সাধারণ মানুষ, সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাই তথ্য অধিকার আইন আরও বেশি ব্যবহার করবে। তথ্যের প্রবাহ আরও বাড়বে। পরিবর্তনের যে ধারা সূচিত হয়েছে, সেটা যদি অব্যাহত থাকে, তা হলে সামনের দিনগুলোতে তথ্য পেতে আমাদের এত কাঠখড় পোড়াতে হবে না। তথ্য অধিকার আইনটি আমরা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারব। তথ্যের ওপর গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হবে স্বচ্ছতা ও সুশাসন।

Mentor's Experience

Ziaul Haq Swapan, News editor, The Daily Star

Right to Information (RTI) Act is a newly enacted law in Bangladesh. Thanks to pursuance of some non-government development organisations that this law was passed by the national parliament two years back. Then ensued the process for its implementation. Side by side efforts are on to create awareness about RTI. The pioneers of the

law identified two main impediments in implementation of RTI – lack of awareness among the masses about the law and the culture of secrecy maintained by our public servants. It's pleasing to note though in a slow manner welcome changes are occurring for a gradual departure from the culture of secrecy. We all want the changes take forth the process of RTI implementation and people reap its benefits. And as media professional we have another expectation here that journalists take advantage of RTI to the benefit of making good investigative reports thereby playing role in establishing transparency and good governance in the society. Mainly to gauge the last two year's advancements towards that goal, MRDI and World Bank Institute took up this initiative. They engaged some newsmen representing two national dailies and one television channel into this exercise. I was one of the three journalists from the Daily Star who got involved and my role was to mentoring two of my colleagues in the newsroom.

On the very outset my two reporting colleagues – Emran Hossain and Porimol Palma – applied under RTI seeking information from some government institutions. Their sole purpose was to make some investigative reports using the information. But in the beginning they had bitter experiences. Government officials did not cooperate them up to their expectations. They were reluctant in providing them information. Even they didn't show the courtesy of giving any replies to the applications the reporters submitted seeking for specific info. Some of them though had provided some information those were partial and half-backed. They (the reporters) experienced almost similar attitudes initially while appealing before the higher authorities seeking for redress to the reluctance showed by their subordinates. Not providing information, killing time and remaining non-responsive and non-communicative were all too commonplace. At last they had to appeal before the Information Commission. The Commission directed the government bodies concerned to provide them the information. Even then the desired information could not be accrued. They did not have all the information, which was the recipe for a good investigative report. Whatever information they could muster probably would suffice for mediocre reporting but not enough to go in-depth.

We must acknowledge here that it was not much of a surprise for us that such predicaments would be there as it was just the beginning of a new journey – the use of RTI – a new path never traversed before. On top of it there are some homegrown problems within the media trade too – those of us in the news management assign our reporters with certain tasks we tend not to give adequate time for them to accomplish that. The time a reporter needs for completing an investigative report often s/he doesn't get that time. Our newsroom culture is keeping reporters busy with multitasks. While being absorbed too much to the daily run-of-the-mill stories, they can't do justice to their assignments of investigative nature. This is the reality.

However, we had all the good intentions and that's why we consciously tried to give our specially assigned two reporters some respite from the mundane day-to-day business. May be that was not yet enough. We tried to discuss with them time to time about the applications of RTI. We also helped creating forum where they could draw upon experiences of other forerunners in the field like Indian journalist Saikat Datta, who excelled in investigative reporting by the application of RTI tools. We also gained from the expertise of Ralph Frammolino and had also interactions with one or two officials from the World Bank Institute.

In a nutshell the whole exercise was a learning process for us. We're still learning how best we can use the RTI vehicle. May be we were exposed to too much of negative experiences so far but we simply can't ignore the positive outcomes too. We must have seen how slowly but steadily a wave of change is taking place. There are changes coming in the mindset of the public officials, who had the wrong notion that they were the custodians of all information. Now they're coming into terms that information is the right of the people and they are bound to provide people with the information. General people are also now becoming aware that their right to information is now guaranteed by law. And application of RTI by journalists has got coinage.

At last I would say there is nothing to get disappointed from the last few months' experiences. Whatever we have learnt through this exercise would come handy in our future works. Nobody would dare to refuse us showing the excuse of nitty-gritty or minor technicalities in application submission in future. They would think twice before killing our precious time in the name of giving us information. In future general people and journalists as well would apply RTI in larger volume and help create a greater and wider flow of information in the society. Riding on the current spate of the changes, we can well expect, in future we would face less hassles in gaining information through RTI applications. We'll be able to use the law in an effective manner. People's right to information would be established. And that would pave way for transparency and good governance.